শুধু গল্প নয়

অমূল্য কর্মকার

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৬৪

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ শঙ্কর বসাক
স্কেচ ঃ অমূল্য কর্মকার

ভোলানাথ প্রকাশনীর পক্ষে ৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯
থেকে সুরেশ দাশ কর্তৃক প্রকাশিত, রেজ ডট কম ৪৪/১এ,
বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে কম্পোজ
এবং ইন্দ্রলেখা প্রেস, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

নিবেদন

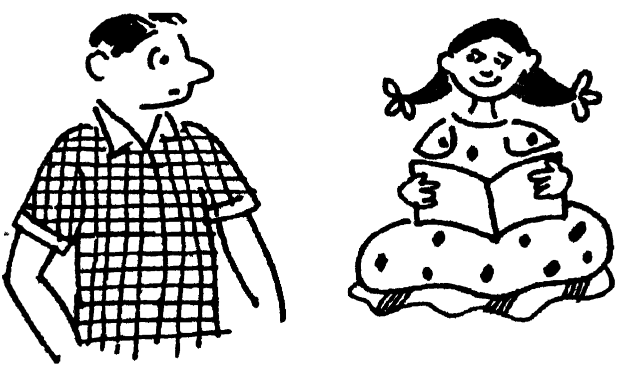
একদিন ট্রেন ধরব বলে বেলঘরিয়া স্টেশনে বসে আছি। পাশেই প্ল্যাটফর্মে দোকান সাজিয়ে এক খাবারের বিক্রেতা রুটী ঘুগনী ইত্যাদি বিক্রী করছেন। খদ্দেররা অধিকাংশই সবজী বিক্রেতা। দোকানদার ঘুরে ঘুরে সকলকে খাবার পরিবেশন করছেন। খদ্দেরগণ খেতে খেতে নিজ নিজ টাকা পয়সার হিসাব নিয়ে ব্যস্ত। অন্য কোন দিকে তাদের তাকাবার অবসর নেই। কিন্তু তারি মাঝে একটি শালিক পাখী দোকানদারের পায়ে পায়ে ঘুরে সকলের পায়ের কাছ থেকে খাবারের ভুক্তাবশেষ সংগ্রহ করছে। বিন্দুমাত্র ভয় ডর নেই। পাখীটির বুদ্ধি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। বুদ্ধিতে কেউ কম যায় না। একদিন এক বধূ তাঁর ছোট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আমাদের বাড়ী এসেছেন। আমাদের বাড়ীর মুখোমুখি তাদের বাড়ী। ফিরে যাবার সময় বাচ্চাটি আপত্তি তুলল। মাকে বলল, অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়ী চল। এই রকম ঘটনা আপনার আমার জীবনে অহরহ ঘটছে। তবু আমরা অনেকেই মনে করি আমাদের জীবন নিতান্তই গতানুগতিক ও নীরস। এই বইখানি পড়ে যদি কেউ অনুভব করেন যে এই সংসারে তাঁরও একটা ভূমিকা আছে তবেই আমার এই প্রয়াস সার্থক বলে মনে করব।

অমূল্য কর্মকার

শুধু গল্প নয়

জীবনের প্রথম পাঠ

ফুটফুটে ছোট্ট শিশু পায়েল। এক দাদু ডাকেন দিদিভাই, অন্য দাদু ডাকেন পায়েল পচা, মা ডাকেন মম্ এবং পিসী ডাকেন নাইকানী। অন্য যে কোন নামে ডাকলেও কিছু আসে যায় না। কারণ এইরকম শিশু আজকাল আমাদের প্রতিটি ঘরে দেখতে পাবেন। এরা নতুন প্রজন্মের শিশু, ভয়ডর কাকে বলে জানে না। তাছাড়া জন্ম থেকেই সবজান্তা এবং সবচাইতে বড় কথা বুদ্ধিতেও বড়রা ওদের কাছে নিতান্তই শিশু। পায়েলও তার ব্যতিক্রম নয়। সবসময় পায়েলকে চোখে চোখে রাখতে হয় কারণ চোখের পলকে এক একটি অঘটন ঘটিয়ে বসে। পড়াশুনার দিকেও বিন্দুমাত্র

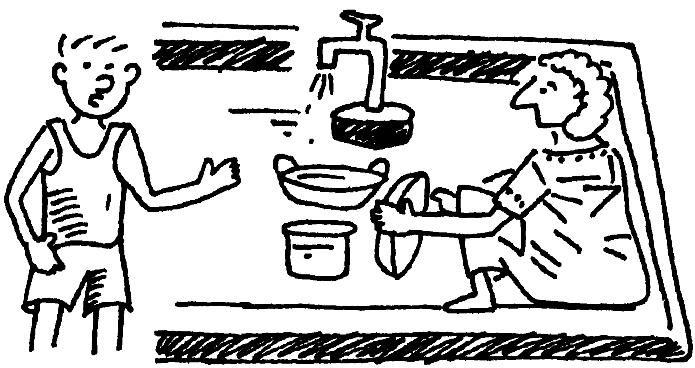


আগ্রহ নেই। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলে? একদিন অরুণ মেঝেতে মাদুর পেতে মাথার উপর ফ্যান চালিয়ে একখানা বর্ণপরিচয় ও খাতা পেন্সিল নিয়ে এল। তারপর মেয়েকে কোলে নিয়ে এসে পড়াতে বসল। খাতায় অ আ লিখে দিয়ে বলল 'এই অক্ষরগুলির উপর পেন্সিল দিয়ে লিখে যাও।' পায়েল বিনা প্রতিবাদে লিখতে শুরু করল। কিন্তু মিনিট দুয়েক যেতেই লেখা বন্ধ করে বলল, 'হাত ব্যথা হয়ে গেছে।' অরুণ এবার খাতা বন্ধ করে বইখানা সামনে মেলে দিয়ে বলল, 'তাহলে বই দেখে অ আ ক খ পড়তে থাক।' পায়েল বাধ্য মেয়ের মত পড়া শুরু করল। কিন্তু আগের মতই খানিক বাদে পড়া বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'মুখ ব্যথা হয়ে গেছে। অরুণ এতটুকু

বিচলিত হলনা। মুখের হাসিটি বজায় রেখে বলল, ' তাহলে পৃষ্ঠা উলটে অক্ষরগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে যাও।' কিন্তু মিষ্টি কথায় পায়েল ভুলল না। সরাসরি মুখের উপর বলে দিল, 'না, চোখ ব্যথা হয়ে যাবে।'

উচ্চাকাঙ্খী

সেবারে খুব ধুমধাম করে সানুকে হাতে খড়ি দেওয়া হল। সরস্বতী পূজার দিন পুরুত মশাই সানুকে কোলে বসিয়ে নুতন স্লেটে অ আ লেখালেন। সানুর মন উৎসাহে টইটম্বুর। ওর রত্নাদিদি একবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'কীরে বড় হলে কী



হবি'? সানু এক নিশ্বাসে জানাল, 'বড় হলে এনজিনীয়ার হব।' এর কদিন বাদেই সানুকে শিশুশ্রেনীতে ভর্তি করান হবে। একটি নামী বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষার দিনও ঘোষিত হল। সানুও সেই পরীক্ষাতে সামিল হবে। সানুর বাবা মা ওকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নাওয়া খাওয়ায় সময় রইলনা। পাখী পড়ার মত সমস্ত সম্ভাব্য প্রশ্ন—যথা কোন্ দেবতার কোন্ বাহন, একটি শুকনো ফলের নাম, একটি নিশাচর পাখীর নাম, দুই অংকের বৃহত্তম সংখ্যা ইত্যাদি এবং সেসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সানুকে মুখস্ত করাতেই দিন কাবার হয়ে যেত। এর মধ্যে আবার সেই বিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়ে নকল মহড়া চলল— কোথায় কোথায় কী কী করণীয় সমস্ত সানুকে বুঝিয়ে দেওয়া হল। সব মিলিয়ে এক ত্রুটীহীন আয়োজন, তবে একটি শিশুর পক্ষে ডোজটা বোধহয় একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। ফলে পরীক্ষার দিনে সানু এতটাই ঘাবড়ে গেল যে কিছুতেই আর পরীক্ষা দিতে গেল না। মিষ্টি কথায় বা প্রলোভন দেখিয়ে কিছুই লাভ হল না। সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। কয়েকদিন পরে রত্না আবার সানুকে জিজ্ঞেস করল, 'এবারে বল বড় হলে কী হবি?' সানু

কোন সাফাই দেবার চেষ্টা করল না। খোলাখুলি জবাব দিল, 'আমি সুনীতার মত বাসন মাজব।'

রাফ এন্ড টাফ

সানুর লেখাপড়া নিয়ে যখন এক অনিশ্চয়তা চলছে তখনই আর এক বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেনীতে ভর্তির নোটিস দেওয়া হল। সংগে সংগে বাড়ীতে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। নতুন করে পরিকল্পনা শুরু হল। সানুকে নিয়ে যাবার এস্‌কর্ট টীম ঢেলে সাজান হল। প্রথমেই সানুর বাবা বাদ গেলেন, কারণ সানু বাবার খুব ন্যাওটা। সেই জায়গায় এলেন সানুর মা। দরকার হলে তিনি সানুর পিঠে দু ঘা লাগিয়ে দিতে পারবেন। পরিবারেই এক আত্মীয় ডাক্তার। তাঁর কাছ থেকে একটি ইনজেকশানের সিরিঞ্জ চেয়ে নেওয়া হল। সানুকে দেখিয়ে ওর মা সেই সিরিঞ্জ নিজের ব্যাগে রাখলেন। আগের বার সানুর প্রিয় জিনিষ সন্দেশ ও সফ্‌ট ড্রিঙ্কের প্যাকেট সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। এবারে সে সব বেমালুম বাদ পড়ল। এস্‌কর্ট টীমে একটি নতুন মুখ দেখা গেল—সে হল পাপু। পাপু তখন নবম শ্রেনীর ছাত্র। কী কারণে জানিনা সানু পাপুকে বেশ সমীহ করে চলে। তবে পাপু খালি হাতে গেল না, পকেটে পুরে নিল গ্যাস ওভেন জ্বালাবার একটি ইলেকট্রনিক লাইটার। সেটির সুইচ টিপলে ঠিকমত স্পার্ক বের হয় কিনা তা সানুর চোখের সামনেই পরখ করা হোল। চারপাশের এত কান্ড কারখানা দেখে সানু একেবারে থ বনে গেল। কথা বলার সাহসটুকু অবধি হারিয়ে ফেলল। তা ছাড়া সে সুযোগও সানুকে দেওয়া হল না। তার আগেই সশস্ত্র পাহারায় সানু পরীক্ষা দিতে রওনা হল। সেখানে কখন কী হল বা কী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল তা সানু নিজেও বলতে পারবে না, তবে সেখান থেকে চলে আসার আগেই জানা গেল ভর্তির তালিকায় সানুর নাম নির্বাচিত হয়েছে। মুহূর্তে সমস্ত পরিবেশ পাল্টে গেল। সকলেই হাসি মুখ নিয়ে বাড়ী ফিরল। সানু যে অভ্যর্থনা পেল তা বলার নয়। সব চাইতে বড় কথা বাড়ীতে পা দিতেই সানুর প্রিয় খাবারগুলো একের পর এক সানুর কাছে আসতে লাগল।

সান্নিধ্য

পার্থ ও সুপর্ণা আমাদের প্রতিবেশী। মুখোমুখি দুটি বাড়ী-মাঝখানে সরকারী রাস্তা। পার্থদের দোতলার জানলা থেকে সরাসরি আমাদের বাড়ীর ভেতরটা দেখতে পাওয়া যায়। শ্রেয়া ওদের শিশু কন্যা। যখন সে কথা বলতে শেখেনি তখনই রত্নাকে দেখতে পেলে দূর থেকে হাত দিয়ে ডাকত। একটু বড় হলে দিদি বলে ডাকতে শিখে গেল। কোলে করে কেউ বাড়ীর বাইরে নিয়ে এলে ও আঙুল দিয়ে দিদির বাড়ী দেখিয়ে দিত। বাড়ীর কাছে নিয়ে এলে ও নিজেই হাক দিত, 'এই দিদি।'

ডাক শুনলেই রত্না ঘর থেকে বের হয়ে ওকে কোলে তুলে নিত। এইরকম প্রতিদিনই ঘটত। একদিন যথারীতি কোলে চেপে ও দিদির বাড়ীর কাছাকাছি এল। প্রতিদিনের মতই হাক পাড়ল, 'এই দিদি।' কিন্তু দিদির উত্তরটা এল ওর ঘাড়ের কাছ থেকে। শ্রেয়া ভীষণ অবাক হয়ে দেখল ও দিদির কোলেই বসে আছে।

শবরী

দিদির জিনিষপত্রের উপরে শ্রেয়ার ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। ড্রয়ার গুলোর সমস্ত জিনিষপত্র বের করে ঘরময় ছড়িয়ে ফেলত, স্কেচ পেনের বাক্স খুলে সেই সব পেন দিয়ে যত্র তত্র আঁকিবুকি আঁকত এবং আরও কত রকমের যে দুষ্টুমি করত তার ইয়ত্তা নেই। তারপর একদিন দিদির বাড়ী আত্মীয়স্বজন ও অতিথি অভ্যাগততে ভরে গেল। উপলক্ষ্য দিদিব বিয়ে। শ্রেয়া মনের আনন্দে হাতে মেহেন্দী পরল এবং মায়ের কোলে চেপে সমস্ত অনুষ্ঠানে গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখল। কিন্তু বিয়ের পরদিন যখন সকলের চোখের সামনে ওর দিদি চোখের জলে বাড়ী থেকে বিদায় নিল তখন শ্রেয়া একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল। বারবার বলতে লাগল, 'দিদি কাঁদছিল' এবং 'আমি মারিনি কিন্তু।' এর পর থেকে শ্রেয়া প্রতিদিনই অভিযোগ জানাত, 'দিদি নিচ্ছে না।' সপ্তাহখানেক পর শ্বশুড়বাড়ী থেকে দিদি ফিরে এলে শ্রেয়া কাছে গেল না—কারণ এ যে শাড়ী পরা দিদি, যে পোষাকে সে দিদিকে এতকাল দেখে এসেছে, সে পোষাকে নয়। শাড়ী পালটে সালোয়ার কামিজ পরে নিলে সে আবার স্বাভাবিকভাবে দিদির সঙ্গে মিশতে শুরু করল। ওকে একজনে একটি প্লাস্টিকের প্যাকেটে ৪/৫টি কুল দিয়েছিল। ও হাতের মুঠোয় সেই প্যাকেট সবসময় বয়ে নিয়ে বেড়াত-এমনকি নিজের মাকেও তাতে হাত দিতে দেয়নি। কিন্তু দিদিকে কাছে পেয়ে ও সেই কুল দিদির হাতে তুলে দিল। রত্না পরম পরিতৃপ্তিতে ভাল খাবার ফেলে সেই কুল মুখে তুলে নিয়েছিল।

খটকা

আমার এক আত্মীয় ছিলেন কলকাতার এক খ্যাতনামা কলেজের অধ্যাপক। কলেজের অদূরেই ছিল তাঁর কোয়াটার। সেখান থেকে কলেজ বিল্ডিং দেখা যেত ছাত্রছাত্রীরা ব্যালকনীতে দাড়িয়ে গল্প করত এবং ক্লাসের ঘন্টা পড়লে যে যার ক্লাসে গিয়ে ঢুকত। অধ্যাপকের শিশুকন্যা ঘরের জানালা দিয়ে সব কিছু খুঁটিয়ে নজর রাখত। একদিন তিনি কলেজ থেকে ফিরে এলে জিজ্ঞেস করল, 'বাপী তুমি কলেজে গিয়ে কী কর—ছেলেমেয়েদের পড়াও নাকি ঘন্টা পেটাও?'

সমজদার

একদিন খুদে রত্না ওর মণিকাকাকে গিয়ে বলল, 'একটা গান শোনাও।' ওর মণিকাকা কম সেয়ানা নয়। সে গলাটাকে বেসুরো করে কাঁপা কাঁপা গলায় একটা গান আউরে গেল। রত্না গম্ভীরভাবে দাড়িয়ে দাড়িয়ে সেই গান শুনল। বলা বাহুল্য গান আদৌ ওর মনঃপূত হয়নি। গান শেষ হলে ও কাকাকে পরামর্শ দিল, 'ওতে একটু সুর দিয়ে দাও।'

পটুত্ব

পটু সবে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বাড়ীর অদূরেই স্কুল। ও একদিন বাড়ীর সিঁড়িতে দুই হাটুর উপর কনুই এবং দুই হাতের তালুতে থুতনী ভর করে চুপচাপ বসে আছে। বাড়ীর হাঁসগুলো আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম। ভাবলাম ওকে একটু বাজিয়ে দেখা দরকার। সদ্য স্কুলে ভর্তি হয়ে অনেক আদব কায়দা রপ্ত করে ফেলেছে। স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে আগেই সকলের হাজিরা নিত এবং সকলের নাম ডাকা শেষ হলে বলত, 'কাকীমা কর্মকার।' যে যেখানেই থাকুক, সকলকেই বলতে হত, 'উপস্থিত'। ওর আর একটি দুর্বলতা ছিল নিজস্ব কোলবালিশের প্রতি। ও কথা শেখার পর থেকে সেই বালিশটিকে বলত, 'কোলিশ বালিশ' এবং যেখানেই ঘুমুতে যেত সেই কোলবালিশটিকে বগলদাবা করে নিয়ে যেত এবং ঘুমের মধ্যেও কাছছাড়া করত না। যাই হোক একথা সেকথা বলার পর আসল কথাটি ওর কাছে পাড়লাম। বললাম, 'তুই কি শুনেছিস হাঁসটা তোর নামে কী কথা বলছে?' ও গোলগোল চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বললাম হাঁসটা বলেছে, 'পটুদিদি এই বাড়ীতে থাকে আর আমরাও এই বাড়ীতে থাকি, কিন্তু দিদি এই পাড়ার যে কয়টা বাড়ী চেনে আমরা তার চাইতে অনেক বেশী লোকের বাড়ী চিনি।' তুচ্ছ হাঁসেদের এইরকম উদ্ধত্যপূর্ণ কথাবর্তা শুনে পটু একেবারে হা হয়ে গেল। তাছাড়া এই ঘটনার সঙ্গে ওর নিজের মান সম্মান এতটাই জড়িত যে ওর এর বাস্তব দিকটা খতিয়ে দেখার অবসর পেল না। পটু খানিকটা ভেবে চিন্তে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কৌশিকদের বাড়ী চেনে?' আমি হাঁসেদের হয়ে জবাব দিলাম, 'চিনি তো।' এবারে পটু আবার ভেবেচিন্তে বলল, 'মালিনীদের বাড়ী?' আমার কাছ থেকে আগের মতই জবাব পেল। সবশেষে আরেকটি মেয়ের নাম বলে সেই বাড়ী চেনে কিনা জিজ্ঞেস করল। আমি এই প্রসঙ্গে ছেদ টেনে বললাম, 'আমরা সব বাড়ী চিনি। আমরা কোথায় কোথায় চলে যাই, পটুদিদি খুঁজে বের করুক তো?' এই কথা শতকরা একশ ভাগ সত্য। হাঁসগুলো কোথায় কোথায় যে

চলে যেত আমরা কেউ খুঁজে পেতাম না—অবশ্য সন্ধ্যার আগেই আবার বাড়ীতে ফিরে আসত। বাস্তব সাক্ষ্য প্রমাণ যে পুরোটাই পটুর বিরুদ্ধে চলে যাবে পটু তা ভাবতেও পারেনি। পটু একেবারে থ বনে গেল। কোন জবাবই খুঁজে পেল না। অবশেষে নিজের সাফাই গাইল, 'ওরা তো জল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যায়।'

আমাকে দেখুন

রত্না এক জিজ্ঞাসু মন নিয়েই পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। ও তখন নিতান্ত দুধের শিশু। সবে মাত্র মুখে কথা ফুটেছে। একদিন বৃদ্ধা ঠাকুমার কোলে উঠে প্রশ্ন করল, 'তোমার দাঁতগুলো কে ভেঙেছে?' এ প্রশ্নের কী জবাব দেবেন ফোকলা ঠাকুমা ভেবেই পেলেন না।

* * *

ওর ঠাকুমা বিকেলে প্রতিবেশীদের বাড়ী গল্প করতে যেতেন। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে আগেই রত্নার খোঁজ নিতেন। বাইরে থেকেই একদিন বললেন, 'কী করস লো রতন?' রত্না তখন বিছানায় শুয়ে। সেখান থেকে জবাব দিল, 'আমি ঘুমিয়ে রয়েছি।'

* * *

একদিন ঠাকুমাকে বিছানা পাততে দেখে ও আরাম করে সেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঠাকুমা আতংকিত হয়ে বললেন, 'তুই যে এখানে ঘুমুতে এলি, একটু পরেই যে বিছানা ভিজিয়ে ফেলবি। ও আশ্বাস দিল, 'আমি প্যান্ট পরে শুয়েছি।'

* * *

ব্যবহৃত শাড়ী জড়ো করে রত্নার ঠাকুমা নুতন কাঁথা পেতে সেলাই করছেন। কাঁথা সেলাই করতে দেখে রত্নাও আগ্রহী হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'এটাতে কে শোবে?' ঠাকুমা জানালেন যে এই কাঁথাতে তিনিই শোবেন। রত্না জিদ ধরল, 'আমি শোব।' ঠাকুমা বললেন, 'তোকে শুতে দিলেই তো কাঁথা ভিজিয়ে ফেলবি।' রত্না বিরক্ত হয়ে বলল, 'বজ্জাত, তুমি বিছানা ভিজাও না, নইলে বিছানা রোদে দাও কেন?'

* * *

রত্না একদিন চলতে গিয়ে ব্যথা পেল। কাঁদো কাঁদো গলায় মাকে সে কথা জানলে ওর মা দরদভরা গলায় বললেন, 'ষাট।' রত্না বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, 'ষাট বললে কমবে না।'

* * *

রত্নার ঠাকুমা ঠাকুর দিতে বসে কপালে তিলক কাটতেন। একদিন তিনি বাড়ী ছিলেন না। অন্য এক আত্মীয়াকে ঠাকুর দিতে বলা হল। রত্না সে কী করে নজর রাখতে লাগল। ঠাকুর দিতে গেলে রত্না তাকে বাধা দিল। বলল, 'আগে তিলক

কাট, তারপর ঠাকুর দেবে।'

*　　　*　　　*

রত্নাকে ওর মা একটা ম্যাক্সী বানিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন ওর ঠাকুমা সেটি পরতে চাইলেন। রত্না সরাসরি সেই দাবী নাকচ করে দিল। বলল, 'তিলকওয়ালা মেয়েরা ম্যাক্সী পরে না।'

*　　　*　　　*

কিছুদিন হল রত্নার একটি ভাই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। একদিন ওর মা বললেন, 'দেখে আয় তোর ভাই এর ঘুম ভেঙেছে কিনা?' শিশুটির সদ্য ঘুম ভাঙলেও এক চোখ পিচুটীতে আটকে আছে। রত্না দেখে এসে জানাল, 'এক চোখে ঘুম রয়েছে।'

*　　　*　　　*

বাড়ীতে এক জায়গায় ওল গাছ হয়েছে। আমি একটা শাবল নিয়ে ওল তুলতে গিয়েছি এমন সময় রত্না হাজির হল। বললাম, 'বলতো এটা কী?' ও বলল, 'তাল।' আমি বললাম বেশ তুমি তাল খাবে।' ও বলল, 'আমি খাব না, গলা চুলকাবে।'

*　　　*　　　*

রত্নাকে ওর মা একদিন কলা খেতে দিয়েছিল। ও কলা খেয়ে খোসাটি বাগানে ছুড়ে দিল। বলল, 'কলার গাছ হবে।'

*　　　*　　　*

একদিন বাড়ীর কয়েকজন মিলে সিনেমা দেখতে গেল। মার কোলে চেপে রত্নাও গেল। ফিরে এসে রত্না সকলকে বলে বেড়াল, 'তোকে সিনেমারী দেখিয়েছি, মাকে দেখিয়েছি, কাকাকে দেখিয়েছি, দাদাকে দেখিয়েছি।'

*　　　*　　　*

একদিন ওর পটুদিদি বাড়ীতে দেখা করতে এল। রত্না দৌড়ে গিয়ে পটুকে বলল, 'আমি স্কুলে ভর্তি হয়েছি।' পটু ওর কথায় আমল দিল না। বলল, 'তুই কী ভর্তি হবি?' রত্না বলল, 'হ্যা মা কালী বিদ্যা।' পটুর আর অবিশ্বাস করার উপায় রইল না। ও ভীষণ অবাক হয়ে ওর কাকীমাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল। ওর কাকীমা বললেন, 'তুই এইটুকু বাচ্চার কথায় কান দিতে গেলি কেন?'

*　　　*　　　*

রত্না একদিন গালে একটা নাড়ু পুরে ঘরে এসে উপস্থিত হল। ওর বাবা বললেন, 'তোর গালে যে ফোঁড়া দেখতে পাচ্ছি।' ও বেজায় খুশী। একটু বাদে বাইরে গিয়ে নাড়ুটা খেয়ে আবার ঘরে চলে এল। এবারে দেখা গেল গালের ফোঁড়া বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। সকলেই অবাক হবার ভান করলেন। ও উৎসাহ পেয়ে বলল, 'আবার গালে ফোঁড়া বানাব।' ওর বাবা বললেন, 'আর ফোঁড়া বানাবার দরকার

নেই, যদি নিতান্তই ফোঁড়া বানাতে চাও, তবে মার্বেল দিয়ে বানাও।' ও বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমি নাড়ু দিয়েই ফোঁড়া বানাব।'

*　　*　　*

রত্নার অ আ ক খ লেখার পদ্ধতি ছিল একটু অন্যরকম। আগে থ লিখে পরে একটু লেজ টেনে দিয়ে অ লিখত। ক লিখতে গেলে আগে ব লিখে সেইসঙ্গে ছোট করে এক সংখ্যাটি জুড়ে দিত।

*　　*　　*

ওর জেঠা পান খেতেন। কিন্তু সেই পান খাওয়াটাই ছিল এক দর্শনীয় ব্যাপার। অরুণ ছিল রত্নার চাইতে সামান্য বড়। পান খাবার সময় হলে সে সমস্ত কাজ ফেলে চলে আসত। খুব যত্ন করে ওর বাপীর জন্য পান বানাত তারপর খুঁজে রত্নাকে ধরে নিয়ে আসত। রত্নার হাত দিয়ে ওর জেঠা পান খেতেন। কিন্তু সেই সংগে আরও কিছু করণীয় ছিল। রত্না জেঠার মুখে পান গুজে দেওয়া মাত্র ওর জেঠা হাত তুলে রত্নাকে বলতেন, 'এত্তো বড় হও।' তারপর অরুণের দেওয়া একটি পানের বোঁটা রত্নার হাতে দিতেন। রত্নাও জেঠার অনুকরণে মাথার উপর হাত তুলত। বাড়ীর সকলে অন্য কাজ ফেলে এ দৃশ্য দেখতে আসত।

*　　*　　*

সামান্য লিখতে শিখেই রত্না নিজের বিদ্যা জাহির করতে লাগল। বাড়ীতে পাঁচ খন্ড মহাভারত ছিল। কয়েকটিতে লিখে রেখেছে বাবার নাম অমূল্য। একটি পেন কিনে সেটির দাম হিসাবের খাতায় লেখা হয়েছিল। দেখি সেখানে গোটা গোটা হরফে লেখা দাদার পেন।

*　　*　　*

একসময়ে বেতালের একই গল্প ইংরেজী এবং বাংলা খবরের কাগজে প্রকাশিত হত। তবে বাংলা কাগজে গল্প একটু পিছিয়ে ছিল। রত্না কাকার বাড়ী গেলে ওর মণিকাকা বললেন, 'বেতালের গল্প খবরের কাগজে দেওয়া আছে, পড়ে দেখ।' রত্না বলল, 'তোমাদের বাড়ীতে ডাকাত আসেনি, আমাদের বাড়ীতে ডাকাত পালিয়ে গেছে।'

*　　*　　*

একদিন রত্নার মা কলতলায় বাসন মাজতে বসেছেন। রত্নাকে ঘর তেকে কিছু দিতে বললেন। রত্না তখন নিজের পুতুল খেলা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। খানিক বাদে মার কথা খেয়াল হল। ও তখন বাইরে এসে ওর মাকে বলল, 'মা তুমি কী দিতে বলেছিলে আমি ভুলে গেছি। আমি তোমাকে কেটলী দিতে পারব না।'

*　　*　　*

রত্নাকে নিয়ে ওর বাবা বইমেলায় গিয়েছিলেন। চতুর্দিকে গল্পের বই ছড়ান। রত্না যে বইতে হাত দেয়, সেটাই ওর মনকে আকর্ষণ করে। বাবার কাছে বই কেনার জন্য আব্দার করে। বাবা বললেন, 'অনেক দাম।' রত্না আর কোন কথা বলল না। যেই স্টলে ঢুকেছিল সেখান থেকে বের হয়ে ওর বাবা অন্য স্টলে ঢুকলেন। রত্না বাইরে দাড়িয়ে রইল। ওর বাবা ডাকলে বলল, 'আমি আর ঢুকে কী করব, তুমিই দেখে এস।'

বীরপুরুষ

শিশুকালে পাপুকে খাওয়াতে বিস্তর ঝামেলার সম্মুখীন হতে হত। ওকে সহজে খাওয়ান যেত না। তাই ওর মা কিঞ্চিৎ কৌশলের আশ্রয় নিতেন। বাটীতে দুধ ভাত মেখে দরজার আড়াল থেকে একটু বাঘ বা শিয়ালের ডাক ডাকতেন তারপর ঘরে ঢুকতেন। পাপু ততক্ষণে দারুণ উত্তেজিত হয়ে গোল গোল চোখ করে চারপাশে তাকাতে থাকত। ওর মা ঘরে ঢুকতেই ও সরাসরি মার কোলে গিয়ে বসত। ইতিমধ্যে হাজারো প্রশ্ন ওর মনে ভীড় করেছে—কী ডাকল, কোথায় ডাকল, কেন ডাকল ইত্যাদি। ওর মা তাড়াহুড়ো করতেন না। একটু একটু করে প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে ওকে খাওয়াতে থাকতেন। বলা বাহুল্য মুহূর্তেই পাপুর খাওয়া শেষ হয়ে যেত।

* * *

পাপু তখন একটু বড় হয়েছে। আমি খেতে বসলেই আমার আসনের পাশে আর একটি আসন পেতে দেওয়া হত। একদিন আমি খেতে বসেই পাপুকে ডাকলাম। ওর উত্তর তৈরীই ছিল। দূর থেকেই জবাব দিল, 'খাব না।' ওর উত্তর নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। শুধু বললাম, 'আজ আর ভাত খেতে হবে না। শুধু আলুভাজা খেয়ে যা।' উত্তর শুনে ওর কিরকম খটকা লাগল। সত্যিই আলুভাজা আছে কিনা দেখতে এল। তারপর আলুভাজা খেতে এসে ভাতও খাওয়া হয়ে গেল।

* * *

পরদিন খেতে বসে আবার পাপুর ডাক পড়ল। ও দূর থেকেই জবাব দিল, 'আজ আলুভাজাও খাব না।' আমি বললাম, 'খেতে হবে না, শুধু গন্ধ শুঁকে চলে যাও।' এই প্রস্তাবে ও আপত্তি খুঁজে পেল না। দূর থেকে গন্ধ শুঁকতে এল। আমি বললাম, 'ও ভাবে হবে না, আমি নিজে বেগুনভাজা তোমার নাকের কাছে ধরব। তাছাড়া কী যে স্বাদ একটু জিভে লাগলেই বুঝতে পারবে।' শেষ পর্য্যন্ত কী হয়েছিল তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারবেন।

* * *

একদিন রত্না ওর মায়ের সঙ্গে লুডো খেলছিল। পাপু এসে ওর মাকে জিজ্ঞেস

করল, 'দিদি কি তোমার গুটি খেয়েছে?' ওর মা খেয়েছে বলতেই পাপু দুহাতে দিদির চুলের মুঠি টেনে ধরল।

* * *

একসময়ে অমর চিত্রকথা দেব দেবীদের নিয়ে বিস্তর বই প্রকাশ করত। তাদের নানা কাহিণী ও অসুরদের যুদ্ধের ঘটনা তাতে চিত্রিত আছে। পাপুকে কয়েকখানা সেই বই কিনে দিয়েছিলাম। ওর অক্ষরজ্ঞান তখনও হয়নি তবুও গভীর অভিনিবেশ সহকারে সেই বইগুলোর ছবি দেখত। সেই ঘটনা ওর শিশুমনে বিস্তর প্রভাব বিস্তার করেছিল। একদিন সবে ভোর হয়েছে এবং পাপুও ঘুম থেকে উঠেছে। ওর মা হাতে ফুলঝাড়ু নিয়ে বসে বসে ঘর ঝাট দিচ্ছিলেন। হঠাৎ পাপু দুহাত জড়ো করে ওর মার ঘাড়ে এক রদ্দা বসিয়ে দিল। আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হল?' পাপুর নির্ভীক জবাব, 'দেবতাদের সংগে যুদ্ধ।'

* * *

কিছুদিন পরের ঘটনা। ও একখানা বই হাতে নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হল। রাহু সূর্যকে গ্রাস করার ঘটনা ওর শিশুমনে আলোড়ন তুলেছে। এ নিয়ে বিস্তর ভাবনা চিন্তাও করেছে। শেষ পর্য্যন্ত একটা সমাধানও বের করে ফেলল। ওর সেই বক্তব্য এবং আমার জবাব তুলে ধরছি ঃ

—যদি রাহুকে মেরে ফেলি?

—রাহু অমর, ও মরবে না।

—যদি মাথাটা টুকরো টুকরো করে দেই?

—তাহলেও বেঁচে থাকবে।

—কিন্তু তখন কি আর অন্যকে গিলে খেতে পারবে?

* * *

বাগানে এক জায়গায় কয়েকটা লাউবীচি বুনে দেওয়া হয়েছিল। কয়েকদিন পরে চারা বের হল। তখন চারপাশে ছোট ছোট কাঠি পুঁতে ঘিরে দেওয়া হল যাতে শামুক সেখানে ঢুকতে না পারে। পাপু সেদিকেও সতর্ক নজর রাখত। নিজে সেই ঘেরা জায়গার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সকলকে সতর্ক করত, 'এখানে ঢুকবি না, এখানে গাছ বোনা আছে।'

* * *

রত্না তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। সেখানে ম্যাজিক প্রদর্শনী হবে। ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছে। কিন্তু তবুও পাপুর উৎসাহ নেই। জিজ্ঞেস করাতে বলল, 'যদি পড়া জিজ্ঞেস করে?'

* * *

একদিন রত্না স্কুলে টিফিন খায়নি। বাড়ি ফিরলে পাপু প্রস্তাব রাখল, 'তোর বিস্কুট দুটো সামনে রাখ। দেখি কে আগে দৌড়ে সেগুলো ধরতে পারে?'

*   *   *

একদিন অনেক বেলা অবধি পাপু বিছানায় শুয়ে আছে। আমি বাইরে কী কাজ করছিলাম। ঘরে ঢুকে বললাম, 'আমাদের ঘরে দুই কুঁড়ে, একটা খাটের উপর অন্যটা খাটের তলায়।' কথাটা কানে যেতেই রত্না লাফিয়ে উঠল। একটা লাঠি সংগ্রহ করে খাটের তলায় উঁকি দিল। সেখানে একটি বিড়াল এক সুটকেশের উপর শুয়ে তোফা ঘুম দিচ্ছিল। শব্দ শুনেই জেগে উঠল। তারপর চোঁ চোঁ দৌড়।

*   *   *

পাপুর কাশি হয়েছে। ওষুধ খেতে ডাকলাম। ও জবাব দিল, 'আমি খাব না, কাশিতেই থাকব।'

*   *   *

একদিন দুপুরে ঘুম থেকে উঠে পাপু চুপচাপ বসে আছে। একটু পরে নিরাসক্তভাবে দিদিকে বলল, 'এক চামচ ভিভা দে তো। দেখি কিরকম স্বাদ?' রত্না কথাটা শুনেই লাফিয়ে উঠল। বলল, 'ভিভা খেয়ে খেয়ে শিশি নিজেই অর্দ্ধেক করে ফেলল, আর এখন বলে কি রকম স্বাদ? স্বাদ আগে যা ছিল, এখনও তাই আছে।' বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে পাপু একেবারে চুপসে গেল। আমি ওর পরিত্রাণে এগিয়ে এলাম। ধমক দিয়ে বললাম, 'আবার দিদিকে কেন? নিজে নিয়ে খেতে পার না?' ও খুশী মনে ভিভা খেতে চলে গেল।

*   *   *

একদিনে ভাই বোনে মারপিট করে দুজনেই বিছানায় শুয়ে আছে। ওদের মা ডাকাডাকি করেও কোন লাভ হল না। তখন দুজনের মাথার কাছে দুটো করে বিস্কুট রেখে তিনি চলে গেলেন। একটু পরে পাপুর মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল। সে খানিক বাদে উঠে পরে নিজের বিস্কুট দুটো খেয়ে ফেলল। খেয়ে ভালই লাগল। মুহূর্তে সব বিক্ষোভ দূর হয়ে গেল। সে খুশী মনে বলল, 'দিদি তো বিস্কুট খাবে না, আমিই খেয়ে নেই।' কথাটা কানে যেতেই রত্না বলল, 'তবে রে শয়তান।' এই বলে ছো মেরে নিজের বিস্কুট দুটো তুলে মুখে পুরে দিল।

*   *   *

একদিন পাপু কণু মিতুদের বাড়ী গেল। ওরা পাশের বাড়ীতেই থাকে। একটু বাদেই কণুর চিল চীৎকার শোনা গেল। রত্না বলল, 'ঐ দেখ পাপু কণুকে মেরেছে।' তারপর পাপু বাড়ী ফিরতেই ও এগিয়ে গিয়ে পাপুর গালে এক চড় কসিয়ে দিল। পাপুও নিজের হাওয়াই চটী দিদির গায়ে ছুড়ে মারল। তারপর দুজনে মারপিট করে

নাওয়া খাওয়া বন্ধ। পরে জানা গেল পাপু কণুর গায়ে আদপেই হাত দেয়নি। ওরা নিজেরাই বাদামের ভাগ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারপিট করেছে।

* * *

পাপু সবে নার্সারী ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। ঠিক কয়েকদিন আগেই ওর মণিকাকার বিয়ে হয়েছে। ও একদিন খুব খুশীমনেই স্কুল থেকে বাড়ী ফিরল। সগর্বে জানাল, 'আন্টি যা জিজ্ঞেস করেছিল, একমাত্র আমিই পেরেছি আর কেউ পারেনি।' ওর কথা শুনে আমরা ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। ওর মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী জিজ্ঞেস করেছিল?' ও বলল, 'কাকার বৌকে কী বলে?' আমি ওর বুদ্ধির তারিফ করে জানতে চাইলাম, 'বল তো দাদার বৌকে কী বলে?' ও বিজ্ঞের মত বলল, 'সেটা এখনও আমাদের পড়ায় নি।'

* * *

মেঝেতে একদিন একটা চিরকুট পড়ে ছিল। পাপু সেটা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে পেল সেখানে কিছু লেখা আছে। লেখাটা নিয়ে পাপু ভাবনায় পড়ে গেল। কোন কূলকিনারা না পেয়ে অবশেষে ওর মার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। প্রশ্ন করল, 'এই কাগজটাতে কে লিখেছে? আমি না ছোটকাকা?'

* * *

এক সময়ে তেলেনী রাম নামে একটি সিরিয়াল দূরদর্শনে দেখান হত। পাপুও দু একদিন তা দেখেছে। হঠাৎ এ নিয়ে পাপুর খটকা লাগল—তেলেনী রাম না তেলেনী রামা? ওর মা তখন রান্না করছিলেন। পাপু সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে রাম না রামা জানতে চাইল। ওর মা কোন সিরিয়ালেরই খবর রাখেন না। তবে পাপুকে হতাশ করলেন না। বলে দিলেন, 'রামা।' পাপুর বুক থেকে মস্ত এক বোঝা নেমে গেল। ও খুশী মনে খেলতে চলে গেল।

* * *

একদিন অফিস থেকে ফেরার পথে কেমিক্যাল মেশান এক টুকরো মোম কিনে নিয়ে এলাম। কাগজে ঘষে খবরের কাগজ থেকে সুন্দরভাবে ছবি উঠে আসে। পাপু ও রত্না সেটা নিয়ে ট্রায়াল দিল। তারপর ঘর ফাঁকা হতেই এক এক করে আলাদাভাবে আমার কাছে এল। প্রশ্ন একটাই—সেটা কার জন্য কেনা হয়েছে। উত্তর তৈরীই ছিল। রত্নাকে বললাম, 'কার জন্য কেনা হয়েছে তা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি যখন খুশী ব্যবহার করতে পার।' পাপুকে বললাম, 'তোমার মার জন্য এটা কিনে এনেছি।' উত্তর শুনে পাপু খুশী হল না। অধৈর্য হয়ে বলল, 'মা এ নিয়ে কী করবে?' আমি জানালাম, 'তোমার মাকে তো কিছু কিনে দেওয়া হয় না, তাই নিয়ে এসেছি।' পাপু তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'এই সেদিনও মেলা থেকে মাকে একটা

সিনেমা কিনে দিলে।'

* * *

একদিন বত্নাকে পাশের বাড়ী থেকে ফুল আনতে বলা হল। পাপুকে সঙ্গে দেওয়া হল। কিন্তু পাপুর সাহসে কুলোল না। দিদিকে ফেলে মাঝপথ থেকে বাড়ী ফিরে এল। ওর দিদি নালিশ জানাল। আমি বললাম, 'ওর সাহসে একটু ঘাটতি পড়েছে। দুপুরে খাবার সঙ্গে এক চামচ করে ঘি বরাদ্দ করে দিচ্ছি। অচিরেই সাহস ফিরে আসবে।'

* * *

একদিন আফিস থেকে বাড়ী ফিরে ঘরে পা দিতেই শুনতে পেলাম পাপু ওর মাকে বলছে, 'তুমিই তো কুঁড়ে।' আমি ওকে সমর্থন জানিয়ে বললাম, 'তোমার মা ভীষণ কুঁড়ে। এই যে তুমি চান করার সময় প্যান্ট কলের পাড়ে রেখে আস সেটাও কোনদিন সময়মত ধুয়ে মেলে দেয় না।' পাপু আর কথা খুঁজে পায় না।

* * *

পাপু সবে একটু একটু করে ইংরাজী শিখতে শুরু করেছে। সুযোগ পেলেই তা প্রয়োগ করে। দিদিকে ডাকতে হলে ইংরেজীতে বানান করে বলে THE THE। একদিন ক্যালেন্ডার দেখে দারুণ উত্তেজনা। বলে, 'আর মাত্র সাতদিন বাকী।' আমরা ওব বক্তব্য বুঝতে পারলাম না। ও উৎফুল্ল হয়ে জানাল, 'সানুর সাতদিন পরে Rice in mouth অর্থাৎ মুখে ভাত।'

* * *

তন্ময় কর নামে একটি ছাত্র ছিল পাপুর সহপাঠী। পাপুর পাশেই প্রতিদিন বসত। ক্লাসে শিক্ষকমশায় যা লিখতে দিতেন দুজনে একসঙ্গে লিখে খাতা জমা দিত। দিনগুলো মন্দ চলছিল না। একদিন শিক্ষকমশায় প্রশ্ন দিলেন—What is your father's name? দুজনেই উত্তর লিখে একসঙ্গে খাতা জমা দিল। তারপরই দুজনের ডাক পড়ল। শিক্ষকমশায় বললেন, 'তোরা কি দুই ভাই নাকি? দুজনেই বাবার নাম এক লিখেছিস।' তন্ময় একেবারে নিরুত্তর।

* * *

পাপুকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বললাম, 'মন ভাল না থাকলে কোন কিছুই ভাল লাগবে না, এমন কি সুস্বাদু খাবারও খেতে ভাল লাগবে না।' ও সে যুক্তি মানতে রাজী হল না। বলল, 'তা কেন? মিষ্টি খাবার সবসময়ই মিষ্টি থাকবে।' আমি উদাহরণ দিয়ে বললাম, 'ধর তুমি একদিন স্কুলে কানমলা খেয়ে এলে। তারপর তোমাকে সন্দেশ খেতে দিলে কি ভাল লাগবে?' পাপু এর কোন জবাব খুঁজে পায় না।

পাপু একদিন বইখাতা নিয়ে স্কুলে চলেছে। এদিকে ওর সহপাঠী বুম্বা ক্লাস কামাই করে ঘরে ফুটবল পেটাচ্ছে। জানালা দিয়ে পাপুকে দেখতে পেয়েই ও লুকিয়ে পড়ল। স্কুল থেকে বাড়ীতে ফিরে পাপুর সে কী আস্ফালন। বলল, 'বুম্বা কি ভেবেছে আমি ওকে দেখতে পাব না?' সেই থেকে বুম্বা পাপুর চোখে চোখে তাকাতে সাহস পেত না। বলা নিষ্প্রয়োজন বিদ্যালয়ে কামাই করলে তার কারণ দেখাতে হয়। ওর কামাই এর রহস্য ক্লাসে বললেই সর্বনাশ।

* * *

পাপু একদিন ব্যাকরণ বই নিয়ে এক কথায় প্রকাশ কর অধ্যায়টি মুখস্ত করছে। এমন সময় হঠাৎ ওর হাঁচি পেল। শরীরের দুই বর্হিদ্বার দিয়েই শব্দ বের হল। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'এটা কি এক কথায় হল?'

* * *

একদিন দুপুরে আমার স্ত্রী সকলের ভাত বেড়ে খেতে ডাক দিলেন। গিয়ে দেখতে পেলাম আসন পাতা হয়নি, জলও ভরা হয়নি। রত্না ও পাপু তখন বিবাদে ব্যস্ত- ওদের মধ্যে আজ কে জল ভরবে আর কে আসন পাতবে? আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'তোমাদের এইগুলিই আসল কাজ আর খাওয়াটা ফোকটে।'

* * *

একদিন পাপু ওর দিদিকে বলল, 'তুই যদি আমাকে বুদ্ধিতে হারাতে পারিস তা হলে তোকে খাওয়াব। ওর দিদি এক কথায় রাজী। সর্ত খুবই সোজা। পাপু যা জিজ্ঞেস করবে শুধু ভুল উত্তর দিতে হবে। খেলা শুরু হল। ও পরপর চারটি প্রশ্ন করল—১) তুই কোন স্কুলে পড়িস? ২) কোন ক্লাসে? ৩) কখন স্কুল বসে? ৪) ক্লাসে কয়জন মেয়ে? ওর দিদিও ভুল উত্তর দিয়ে গেল। এরপরেই প্রশ্ন করল, 'কয়টা হল?' তখন মুখ ফসকে ওর দিদি সঠিক উত্তর বলে দিল।

* * *

পাপু এই দুই একশ অবধি রপ্ত করে প্রশ্ন রাখল, 'উনকুড়ি বলে না কেন?' ওর যুক্তি অভ্রান্ত। কারণ উনত্রিশ, উনচল্লিশ থেকে উননব্বুই পর্য্যন্ত যে নিয়ম মেনে চলা হয়েছে, উনিশের বেলাতেই তার বিরল ব্যতিক্রম।

* * *

ওকে রামকৃষ্ণকে নিয়ে ছবির বই কিনে দেওয়া হয়েছিল। ও পড়তে না জানলেওসেই বই-এর ছবি দেখে বলে দিল, 'ক্ষুদিরাম ছাতা ফেলে গিয়েছে।' আমরা সকলেই সেই বই পড়েছি। অথচ কারো নজরে এটা পড়েনি। একটি ছবিতে আছে রামকৃষ্ণদেবের পিতা ক্ষুদিরাম ভিটেছাড়া হয়ে সপরিবারে চলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। জিনিষপত্র বাঁধাছাদা করে রেখেছেন। দ্বিতীয় ছবিতে তিনি সপরিবারে

জিনিষপত্র নিয়ে গমনরত। প্রথম ছবিতে জিনিষপত্রের মধ্যে একটি ছাতা ছিল, দ্বিতীয় ছবিতে সেটি অনুপস্থিত।

* * *

একবার আসাম থেকে ওর সতুদা বেড়াতে এল। প্রথমে অন্য আত্মীয়ের বাড়ী উঠল। সেখান থেকে পাপুর ছোটকাকা সাইকেলে চাপিয়ে ওকে এখানে রেখে গেল। সতু দিব্যি খেয়েদেয়ে আমাদের বিছানায় ঘুম দিল। ঘুম থেকে উঠে কখনও বা টিভি চালায় কখনও বা আলমারী থেকে গল্পের বই বের করে পড়ে। পাপু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। রাতে ওর দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল। ওর মাকে বলল, 'তুমি কোথায় শোবে?' ওর মা জানালেন যে তিনি নীচে মেঝেতে শোবেন। তারপরেই প্রশ্ন করল, 'ও কোথায় শোবে?' সতুর উপস্থিতি ও ভালচোখে দেখেনি এবং বলা সত্বেও ওকে দাদা বলে ডাকেনি। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'ও কে?' পাপু বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বলল, 'ছোটকাকা যাকে রেখে গিয়েছে।'

হিং টিং ছট

এক ফোঁটা শ্রেয়াকে কোলে নিয়ে রাস্তায় পায়চারি করছি। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কীরে তুই ঘুড়ি ওড়াতে পারিস?' ও সবজান্তার মত বলল, 'পারি তো।' তারপর মুখে সুর করে ভো কাট্টা বলে গেল।

* * *

ভুটিয়া ওর মার কোলে বসে থেকেই সব দিকে নজর রাখত। একদিন ওর মাকে বলল, 'তুই মামাবাড়ী চলে যা-যাবার সময় আমাকে কোলে নিয়ে যাবি।'

* * *

পিসীর বিয়ে উপলক্ষ্যে মা ঠাকুমা ও দাদুর সংগে সুদূর আসাম থেকে অসীম খড়দহ এসেছে। ও বিশুদ্ধ বাঙাল ভাষায় কথা বলে। ওর মুখ থেকে বাঙাল কথা শোনার জন্য সকলেই মুখিয়ে থাকে এবং সুযোগ পেলেই ওর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয়। একদিন ওর বাবা ফোনে ওদের খোঁজখবর নিলেন এবং অসীমও ফোনে বাবার কথা শুনল। ফোন রাখতেই ঝুন্টু এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, 'কীরে অসীম বাবায় কি কইল?' অসীম একগাল হেসে জবাব দিল, 'বাবায় আমাকে হ্যালো কইছে।'

* * *

বিলটুকে সকলেই নাম ধরে ডাকে বলে ওর আক্ষেপ কম নয়। একদিন ও বিরক্ত হয়ে ওর দাদাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোরা বড় হলে আমাকে কী বলে ডাকবি?'

* * *

সতু ও অপু ওদের মায়ের সঙ্গে মামাবাড়ী বেড়াতে এসেছে। সন্ধ্যাবেলা বাচ্চাদের

খাইয়ে দাইয়ে ওদের মা বিছানায় শুইয়ে দিতেন। খাটের পাশে নীচে বসে ওদের দিদিমা সেই সময়ে পূর্জাচনা করতেন। সকালে যখন ওদের ঘুম ভাঙত তখনও তাঁকে সেইখানে সেই অবস্থায় দেখা যেত। দিদিমার কান্ড কারখানা দেখে অপু একেবারে তাজ্জব বনে গেল। একদিন সকালে মশারী থেকে নিজের মাথাটি বের করে অপু তার দিদিমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি রাতে ঘুমোও না?'

* * *

সকালবেলা টুকুকে দুধ খাইয়ে পটিতে বসিয়ে পায়খানা করিয়ে ধুয়ে মুছে ওকে পরিষ্কার করে ওর মা নিজের কাজে চলে গেলেন। মা চলে গেলে টুকু নিজের দুহাতে সাবান ঘষতে বসল।

* * *

একদিন ঝিলিককে খাইয়ে দাইয়ে ওর মা বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'আজ আর আমি ঘুম পাড়াতে পারব না, আমার অনেক কাজ আছে। নিজে নিজেই ঘুমিয়ে পড়। ঝিলিক নিজেকেই নিজে চাপড়ে ঘুম পাড়াতে লাগল।

* * *

টুকলু জন্মদিনের পোষাকেই সারাদিন থাকতে ভালবাসে। প্যান্ট পরিয়ে দিলে মুহূর্তে তা খুলে রাখে। কিন্তু চান করার সময় গামছা পরিয়ে না দিলে কিছুতেই বাথরুমে ঢোকে না।

* * *

পাপুকে একদিন ঘুম পাড়াতে গিয়ে ওর মা হিমসিম খেয়ে গেলেন। এমন সময় স্বপ্নাকে দেখতে পেয়ে পাপুকে নিয়ে যেতে বললেন। স্বপ্না পাপুকে ডাক দিতেই ও বলল, 'না যাব না, তুই ঘুম পাড়িয়ে রাখবি।' অন্যদিন ওর বাড়ী ঘুমুতে গিয়ে বলেছিল, 'পপ্পা, আঙ্গুল খাব?'

* * *

বাড়ীতে রুটী তৈরী হতে দেখলেই খুদে অরুণ একটা বাটী হাতে নিয়ে সেখানে হাজির হত। বলত, 'রুটী খাব।' রুটী দেওয়া হলে বলত, 'চিনি দাও।' তারপর বাটী হাতে অন্য ঘরে চলে যেত। সেখানে শুধু চিনিটুকু খেয়ে নিয়ে রুটীশুদ্ধ বাটী রান্নাঘরে আবার ফেরৎ দিয়ে যেত।

* * *

খুদে বাপন রাঁচী থেকে খড়দহে জেঠার বাড়ী বেড়াতে এসেছে। সেখানে এক প্রতিবেশী বাচ্চা শিশুটির পরিচয় জানতে চাইলে বাপন নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি আবীরের ভাই, মায়ের ছেলে।'

* * *

বাচ্চা পায়েল ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু একসময় পাপু ডাকাডাকি করেও

ওর সাড়া পেল না। একটু পরে ঘরে ঢুকতেই পাপু বলল, 'কোথায় ছিলি? এতক্ষণ সাড়া দিসনি কেন?' ও বলল, 'আমি প্যান্ট পরছিলাম।'

* * *

একদিন জেঠার বাড়ীতে সানুর খাবার ডাক পড়ল। কারণ ওর বাড়ীতে তখনও রান্না হয়নি। খেতে বসে ও বলল, 'এই বললে আমার নেমতন্ন, আর এখন শুধু দুধ ভাত।' তখন পটুদিদি একটা রসগোল্লা এনে পাতে দিতেই সানুর মুখে হাসি ফুটল।

* * *

সানু শিশু শ্রেনীতে ভর্তির জন্য তৈরী হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'বল তো কোন ঠাকুরের রং কালো?' ও বলল, 'যে ঠাকুর সাবান মাখে না।'

* * *

আমাদের বাড়ীতে অরুণ ডাক্তার। একদিন পাপুকে একটা টক্সয়েড ইনজেকশন দিয়ে বলল, 'এখনও অনেকটা ওষুধ রয়েছে, ফেলে দেওয়া ঠিক হবে না। সানু চলে আসুক।' সে কথা কানে যেতেই সানু যে কোথায় লুকিয়ে পড়ল, আর ওকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

* * *

সানুকে একদিন ওর মা বললেন, 'পাপু দাদা ও রত্না দিদিকে বিরক্ত করবি না ওদের পরীক্ষা।' ও বলল, 'মেম্মার (মেজমার) পরীক্ষা নেই তো?'

একদিন একটা কাককে চান করতে দেখে রত্না বলল, 'ওটা চান করছে কেন?' ওর বাবা কাকেদের হয়ে বললেন, 'নইলে আমাদের কালো দেখায়।' একটা শালিককে ড্রেনের পাশে ঘুরতে দেখে খুদে পাপু প্রশ্ন করেছিল, 'ওটা ছছি না?' ওর বাবা বললেন, 'হোক গে ছছি, আমরা তো আর ঘরে ঢুকব না।'

* * *

পাপুকে একদিন একটা ছবির বই দেখিয়ে বললাম, 'এই দ্যাখ্ মহিষাসুর মুহূর্তে মহিষ হয়ে গেল। ও প্রশ্ন করল, 'কিন্তু মাথার মুকুটটা কী হল?'

* * *

পায়েলের দাদু একদিন পায়েলকে একটা লোকাল ট্রেনের টাইম টেবিল দেখতে বললেন। ও কিছুতেই তাতে হাত দিল না। বলল, 'আমি কি একা ট্রেনে চড়তে পারি?'

* * *

খুদে আকাশকে ওর মা কোন কাজ করতে বলেন না। এই নিয়ে ওর দুঃখ কম নয়। ও একদিন বলল, 'মা আমাকে ভালবাসে না। দিদিকে বাসন মাজতে বলে আমাকে বলে না।'

*

বাড়ীতে একটা হুলো বেড়াল এত বজ্জাতি করত যে রত্না ওকে হনুমান বলে ডাকত।

*　　*　　*

ঝিলিক আমাদের বাড়ীতে এলেই এটা সেটা ছুড়ে ফেলত। সেই সংগে মুখে বলত, 'এ মা।' ওর মার কাছ থেকে ও এই কথা শিখেছিল।

*　　*　　*

খুদে অরুণকে খাইয়ে দিলে ও সটান নিজের মার কাছে চলে যেত। তিনি ওর টিপে টিপে পেট ভরেছে বললে অরুণ খুশী মনে চলে যেত।

বুনিয়াদ

একটি নামী বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেনীতে ভর্তির জন্য পরীক্ষা চলছে। বারশ'র উপর পরীক্ষার্থী—তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে বড় জোর পয়ত্রিশ জনকে ভর্তি নেওয়া হবে। উদ্বিগ্ন মুখে শিশুদের অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ের গেটের সামনে বসে আছেন। তাদের বসার জন্য প্যান্ডেল খাটিয়ে চেয়ার পেতে রাখা হয়েছে। আমার শিশুপুত্রও একজন পরীক্ষার্থী। আমার স্ত্রী ও কন্যা উদ্বিগ্ন মুখে অভিভাবকদের সঙ্গে বসে আছে। অমার মেয়ে তখন তৃতীয় শ্রেনীতে পড়ে। একসময় পরীক্ষা শেষ হল। পরীক্ষার্থী শিশুদের প্রত্যেককে একটি করে খাবার ঠোঙ্গা হাতে দিয়ে পরীক্ষার হল থেকে বের করা হচ্ছে। তারপর বাবা মায়েরা নিজ নিজ বাচ্চাদের সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মুস্কিল হল শিশুরা মিষ্টির প্যাকেট হাতে পেয়ে এতটাই খুশী যে কে কিরকম পরীক্ষা দিল সেকথা বলার অবসর তাদের নেই। বাচ্চাদের এই কান্ড দেখে আমার মেয়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। বাড়ী ফিরে এসে আমাকে জানাল, 'জান বাবা যে লিখতে পেরেছে আর যে কিছুই পারেনি, সবাই দেখি হাসতে হাসতে পরীক্ষার হল থেকে বের হচ্ছে।'

বকলমে

রত্না একদিন বেজায় খুশী। কি কারণে খুশী তা আমাদের অজানা। কলেজে ক্লাস নিয়ে জেঠা বাড়ীতে পা দিতেই ও এক দৌড়ে জেঠার কাছে গিয়ে হাজির হল। বলল, 'জেঠা আজও তুমি লুডো খেলায় হেরে গিয়েছ।' জেঠা আমতা আমতা করে বললেন, 'আমি আবার কখন খেললাম?' ও খুশীতে ডগমগ হয়ে উত্তর দিল, 'তোমার হয়ে আমিই খেলেছি।'

অবাক জলপান

একদিন খুদে পটুর কাছে ওর বাবা এক গ্লাস জল খেতে চাইলেন। পটু আপত্তি

করল না তবে সর্ত রাখল, 'তাহলে আমাকেও জল খাওয়াতে হবে।' তারপর ও পাশের ঘরে গিয়ে এক গ্লাস জল এনে ওর বাপীর হাতে দিল। জল খাওয়া শেষ হলে পুনরায় গ্লাস ধুতে পাশের ঘরে গেল। তারপর খালি গ্লাস এনে ওর বাপীকে দিয়ে ও চেয়ারে বসে রইল। পটুর বাবা জল আনতে পাশের ঘরে চললেন।

নজরদারী

আমার এক আত্মীয়া বাড়িতে নুতন কাজের ঝি নিয়োগ করেছেন। সে কাজ করতে এলে তিনি তাঁর ছোট ছেলেকে আড়ালে ডেকে বললেন ঝি এর উপর একটু নজর রাখতে। শিশুপুত্রটি কর্তব্যে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেনি। ঝি চলে যাবার আগেই সকলের সামনে জানিয়ে দিল, 'ঝি কিচ্ছু চুরী করেনি।'

বুদ্ধিরূপেণ

একবার রত্নার মার একটি মেজর অপারেশন হয়েছিল। কিছুদিন পরে তিনি রান্না ঘরে গিয়েছেন। তখনও পুরোপুরি সুস্থ নন। বিশেষ নড়াচড়াও করতে পারেন না। দাড়িয়ে দাড়িয়ে মাছ ভাজছেন। বোয়াল মাছ আনা হয়েছে, ভাজতে গিয়ে গরম



তেল মুখে ছিটকে আসছে। তিনি অসহায় অবস্থায় দাড়িয়ে আছেন। রত্না দেখতে পেয়েই বলল, 'ব্যবস্থা করছি।' তারপর ওর তাক থেকে একটা মুখোস খুঁজে বের করে সেটি ওর মায়ের মুখে লাগিয়ে দিল। ওর মা মুখোস করে রান্না করতে লাগলেন।

চেনার উপায়

একবার পিন্টুকে কিশলয় বই কিনে দেওয়া হয়েছিল। ওর দাদা সেই বই থেকে মনীষীদের ছবি দেখিয়ে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ও গান্ধীজী ও নেতাজীর ছবি দেখেই চিনতে পারল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় আটকে গেল। দেখা গেল ও ছবির নীচে লেখা নাম বানান করে পড়ার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে সেই লেখা ঢেকে দেওয়া হল। পিন্টু থতমত খেয়ে বলল, 'বারীন্দ্রনাথ।' এই নিয়ে ঠাট্টা করাতে ও বিজ্ঞের মত বলল, 'কী রকম ছবিটা, রবীন্দ্রনাথকে চেনাই যায় না।'

সেয়ানে সেয়ানে

একদিন সবে ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় পায়চারি করছি। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। খানিকবাদেই দুধের ডিপো থেকে দুধ আনতে যাব। এমন সময় অরুণেরও ঘুম ভাঙল। ও তখন খুবই ছোট। ভাবলাম ওকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক। আমাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা হুবহু তুলে ধরছি :

—অরুণ, তুমি যখন উঠে পড়েছ, তাহলে দুধটা নিয়ে এস।

—বৃষ্টি যে।

—তাহলে ছাতা নিয়ে যাও।

—যদি আছাড় পড়ি?

—তাহলে বাড়ীতে এসে জামাকাপড় ধুয়ে ফেলবে।

—কিন্তু সবাই হাসবে।

—না, কেউ হাসবে না।

—না হাসবে।

—তাহলে আস্তে আস্তে হেটে যাও।

—না আমি জোরে জোরে হাটব।

সাত পাকে বাধা

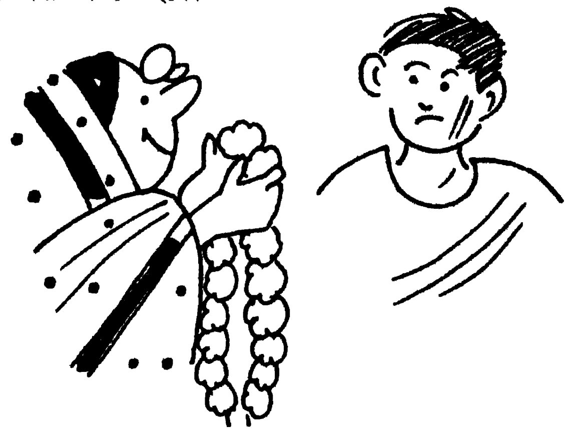
এক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মালদহ থেকে রত্নার দিদিমা এখানে এসেছেন। তিনি ছিলেন খুবই বিদুষী এবং সুন্দরী মহিলা। তিনি বহুবিধ গুণেরও অধিকারিনী ছিলেন। দেখা গেল তিনি অরুণের কাছে কিছু প্রস্তাব রাখছেন আর অরুণ শুধু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। অরুণের মুখচোখ দেখে মনে হল ও গুরুতর সমস্যায় পড়েছে। যেটুকু কথা কানে এল তাই তুলে ধরছি :

—অরুণ আমি অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছি, আমাকে নিরাশ কোরনা।

—আমি সুন্দরী ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না।

-তুমি আমার মুখের দিকে একবার শুধু তাকিয়ে দেখ, তারপর তোমার মতামত দাও।

—ভাল রান্না জানতে হবে।



—বেশ আমি একদিন রান্না করে তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছি।

—গান জানতে হবে।

—তাও জানি, যখন বলবে তোমাকে গান শুনিয়ে দেব।

—ফর্সা হতে হবে।

—আমি তো ফর্সাই।

যে অরুণের দাপটে আমরা নাজেহাল সেই অরুণও নিজের যুক্তিজালে নিজেই জড়িয়ে পড়ল। সে নিজের বিয়ে ঠেকাবার আর কোন পথই খুঁজে পেল না। ওর মুখ চোখ লাল হয়ে গেল। কথা যখন পাকা হতে চলেছে তখন অরুণ হঠাৎ বলে ফেলল, 'আমার চাইতে বড় কাউকে বিয়ে করব না।' বাধ্য হয়ে রত্নার দিদিমা পিছু হটলেন। অরুণও হাঁফ ছেড়ে বাচল।

প্রাপ্য

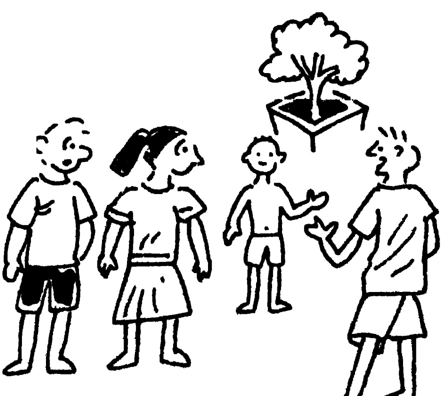
অরুণ আর পটু তখন নিতান্তই শিশু। একবার ওদের মা জ্বরে আক্রান্ত হওয়াতে অরুণকে বললেন, 'কদিন ঠাকুর দিবি, আমি তোকে পয়সা দেব।' অরুণ বেজায় খুশী। ওর বুদ্ধি অনুযায়ী ঠাকুরকে জল বাতাসা দিত, সন্ধ্যায় অন্যকে দিয়ে ধূপকাঠি ধরিয়ে সন্ধ্যাবাতি দিত। কদিন পরে ওকে পয়সা দিতে গেলে পটুও এসে হাজির হল। ওদের মা বললেন, 'তোকে পয়সা দিতে যাব কেন?' পটু অম্লান বদনে জানাল, 'আমি যে উলু দিয়েছিলাম।'

বাঘবন্দী

শিশুকালে অরুণকে বাগে আনা সহজ সাধ্য ছিল না, কারণ ও ছিল বেজায় বুদ্ধিমান। ওকে বলতাম, 'লীডার অব দি অপোজিসন', কারণ ওর কাছে কোন প্রস্তাব রাখলেই ও তার বিরোধীতা করত। ওকে নিয়ে কিরকম সমস্যায় পড়তাম তার একটি নিদর্শন তুলে ধরেছি। একদিন ওকে ওর মণিকাকার জিম্মায় রেখে সকলে কোন আত্মীয়বাড়ি গিয়েছে। বলা হয়েছিল বিকেলে ওকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাবে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ি ফিরে দেখতে পেলাম ওর মণিকাকা জামাজুতো পরে মুখখানা বেজার করে বাইরে এক চেয়ারে বসে আছে আর অরুণ তার জন্মদিনের পোষাকে ঘরময় জিনিষপত্র এদিক ওদিকে ছড়িয়ে তছনছ করছে। ওর মণিকাকা তিক্তকণ্ঠে জানাল, 'সেই বিকেল থেকে সেধে যাচ্ছি। যত বলি-চল পোষাক পরবি তারপর বেড়াতে যাবি, ততই না না করে যাচ্ছে। জোর করতে গেলে চীৎকার সুরু করে।' আমি বললাম, 'ওকে কোন কথাবলার দরকার কী?' এই বলে অরুণের হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলাম। তারপর জামা জুতো পরিয়ে অরুণকে ওর হাতে দিয়ে বললাম, 'হাত ধরে নিয়ে যা কিন্তু ভুলেও ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবি না।' অরুণ বিনা প্রতিবাদে বেড়াতে চলে গেল।

সাক্ষী গোপাল

একদিন বাড়ী ফিরে দেখতে পেলাম কচিকাঁচাদের রীতিমত বিচারসভা বসেছে। বিচারকের ভূমিকায় আমাদের প্রতিবেশী একটি বালক। নাম সম্রাট। ও ছোটদের দলনেতা এবং সকলেই ওকে মেনে চলে। অভিযুক্তরা হল রত্না, শম্পা, প্রসাদ ও



পাপু। ওদের মধ্যে পাপু সবচাইতে ছোট। পাপুই সম্রাটের দিকে ঢিল ছুড়েছে

এবং অন্যরা প্ররোচনা দিয়েছে। কিন্তু মুস্কিল হল সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব অস্বীকার করল। তখন সম্রাট বলল, 'বেশ তোরা তুলসীগাছ ছুঁয়ে বল।' তখন দেখা গেল সকলেরই মুখ শুকিয়ে গিয়েছে এবং কারো মুখে আর রা নেই।

ফস্কাগেরো

পায়েল বিকেলে সঙ্গী সাথীদের সংগে খেলাধূলা করে। তাতে কাজের মেয়ে সুনীতাও যোগ দেয়। পায়েল ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে ওর মায়ের সঙ্গে মামাবাড়ী যাবে। যাবার আগে সুনীতাকে পরামর্শ দিল, 'তুই দুদিন ছুটী নিয়ে নে, আমি ফিরে এলে কাজ করতে আসবি।' দুদিন বাদে পায়েল বাড়ী ফিরলে ওর ছোট দাদু বললেন, 'বুঝলি রে পায়েল বাড়ীতে কী কান্ড ঘটেছে। তুই যাবার পরেই সুনীতা এসে বলল —দুদিন আসব না। আমরা বললাম— তোকে বেঁধে রেখে দেব। সেই থেকে ও এখানেই আছে। তোদের বাড়ীতে খায় এবং রাতে তোর বিছানায় শুয়ে থাকে।' এ কথা শুনে পায়েলের মুখখানা মুহূর্তে কালো হয়ে গেল। ও আর কোন কথাই বলতে পারল না।

তুই

ছোটবেলায় পিন্টু ওর নেনুদির কোলে থেকেই সংসারের হালচাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। একদিন মাকে ট্রাঙ্ক থেকে ভাল শাড়ী বের করতে দেখে নিজেই দিদিকে ডেকে বলল, 'নেনুদি আমাকে বাইরে নিয়ে চল। মা তো এখন বেড়াতে যাবে।' ওর নজর এড়িয়ে কোন কাজ করাই সম্ভব ছিল না। অন্যদিন উঠান পার হয়ে ও বড় ঘর থেকে রান্নাঘরে যাচ্ছে এমন সময় পেছন থেকে কেউ ওকে ডাকল। ওকে পিছু থেকে ডাকা হচ্ছে বলে ও সঙ্গে সঙ্গে মার কাছে নালিশ করল।

রেনুর দায়িত্ব ছিল ছোটভাই পিন্টুকে দেখাশোনা করা। পিন্টুকে খাইয়ে দাইয়ে ও ঘুম পাড়াতে বিছানায় নিয়ে যেত। কিন্তু খানিক বাদে ও নিজেই ঘুমিয়ে পড়ত। তখন পিন্টু আলগোছে ওর হাতের তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসত এবং সারা দুপুর দুষ্টুমি করে বেড়াত। রেনু যখন রাতে পিন্টুকে খাওয়াত তখন মা প্রায়ই বলতেন, 'রাতে দুটো উনা খাস।' কিন্তু উনা খাওয়া নিয়ে কোন তৎপরতা দেখা যেত না। একদিন পিন্টু বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। দুহাতে দিদির চুলের মুঠি ধরে বলল, 'তুই কোনদিনই আমাকে উনা দিস না।' অন্য ভাইবোনেরা গিয়ে রেনুকে উদ্ধার করল। বলা বাহুল্য উনা মানে যে কম এই ধারণা এখনও অনেকের নেই।

উচিৎ শিক্ষা

রত্না শিশুদের খুবই ভালবাসে। মুহূর্তেই যে কোন শিশুকে ও গল্প বলে, খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে আপন করে নিতে পারে। প্রতিবেশীরাও নিজ নিজ শিশুদের ওর জিম্মায় রেখে বাইরে নিজেদের কাজ সারেন। একদিন সানু ও চুচু এই দুই যমজ বাচ্চাকে রত্নার কাছে রেখে ওর মা বাইরে কোন কাজে গিয়েছেন। ওদের খাটে ঘুম পাড়িয়ে রেখে রত্না খাটের পাশে মেঝেতে শুয়ে আছে। হঠাৎ চুচুর ঘুম ভেঙে গেল। সে নিজেই খাট থেকে নামতে গিয়ে রত্নার গায়ে গিয়ে পড়ল। চুচু খুব বিরক্ত হয়ে রত্নাকে এক ধমক দিল। তাতেও সে সন্তুষ্ট হল না। তারপর দুহাতে রত্নার চুলের মুঠি ধরে রত্নার গালে এক কামড় বসিয়ে দিল।

ফোকট

রত্নার বেশ কিছু বেতালের বই ছিল। সেই বইগুলি সে কিছুতেই হাতছাড়া করত না। প্রতিবেশী বালক বাপটু কী করে সেই সব বই এর সন্ধান পেয়ে গেল। সে ক্লাসের সহপাঠীদের কাছ থেকে এমন সমস্ত বই-এর সন্ধান আনতে লাগল যে রত্নার পক্ষে আর মুখ ফিরিয়ে থাকার উপায় রইল না। এক এক খানি পছন্দসই বই রত্নাকে দিয়ে তার বিনিময়ে সে রত্নার কাছ থেকে একখানি করে বই নিয়ে যেত এবং পড়া শেষ হলে আবার বইগুলি যথাস্থানে ফেরৎ দিত। বাপটুর যদিও নিজের বলতে একখানি বইও ছিল না তবু শুধু বই বিনিময় করে বিস্তর বই পড়ে ফেলল।

নালিশ

একদিন বিকেলে অরুণ তাস খেলায় ব্যস্ত। এমন সময় পাশের গলি থেকে শিশুকন্যা পায়েলের চিল চীৎকার ভেসে এল। পায়েলের মা ছুটে গেলেন। একটু বাদে পায়েল এসে বাবার কাছে নালিশ করল, 'কাকা মেরেছে।' কাকা অর্থাৎ সানু ওরই সমবয়সী, শুধু সামান্য বয়সে বড়। নালিশ শুনে অরুণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'এবারে বল কাকা মারার আগে তুমি কী করেছিলে?' পায়েল সরল মনে জবাব দিল, 'আমি কাকার চুল ধরে টেনেছিলাম।'

একা একা

আরেকদিনের ঘটনা। সবে তাসের আড্ডা জমে উঠেছে এমন সময় বাইরে থেকে

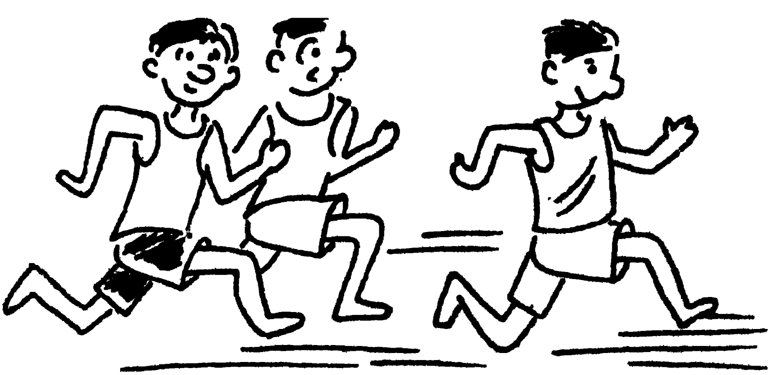
খেলে এসে পায়েল তার বাপীকে বলল, 'পা ধুইয়ে দাও।' অরুণের তখন এদিকে তাকাবার অবসর নেই। পায়েলকে বলল, 'তুই নিজে নিজেই পা ধুয়ে নে, তুই তো পা ধুতে পারিস।' পায়েল বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমি কি একা একাই সব কাজ করব?'

সংক্ষেপে

পটু তখন খুবই ছোট। সবে কথা বলতে শিখেছে। সংক্ষেপে সব কাজ সারত। ওর মণিকাকাকে বলত মক্কা। ওর মণিকাকা সেতার বাজাত। বাড়ীর অদূরেই দূর্গাপূজার প্যান্ডেল্ করা হয়েছে। পটুকে কোলে নিয়ে ওর মণিকাকা প্রতিমা দেখাতে নিয়ে গেল। ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু লক্ষ্য করল। সেখানে ওর পরিচিত একটি জিনিষই দেখতে পেল। প্রতিমা দর্শন করে খুশীতে ওর মন ভরে গেল। বাড়ী ফিরে এলে ওর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে শুধু মাথা নেড়ে বলল, 'ভাল ভাল।' তারপরেই ওকে জিজ্ঞেস করা হল, 'কী দেখলি?' ও বলল, 'সেতাট।'

বিজয়ী

পাপু তখন পঞ্চম শ্রেনীতে পড়ে। বিদ্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে। ও মাথায় একটু লম্বা বলে উঁচু ক্লাসের ছেলেদের গ্রুপে ওকে অন্তর্ভূক্ত করা হল। ওর একটাই



ইভেন্ট— দৌড়। কিন্তু সেটি নিয়ে ওর বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। জিজ্ঞেস করলেই বলত— 'সিনিয়রদের সংগে পড়েছি।' প্রতিযোগীতা শেষ হলে ও এক গাল হাসি নিয়ে বাড়ী ফিরল। বলল, দিয়েছি চার জনকে হারিয়ে।'

কাগজে কলমে

একদিন পাপু এসে বন্ধুদের জানাল অংকের সাহায্যে অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলা যায়। সকলেই জানতে চাইল ব্যাপারটা কী। ও গম্ভীরভাবে বলল, যেমন মৃতকেও জীবিত করে তোলা যায়। কিন্তু তাও কি সম্ভব? ও তার ব্যাখা দিল- অর্ধমৃত কথার অর্থ অর্ধজীবিত বলে ধরে নিতে কারোই আপত্তি থাকতে পারে না। এবারে অর্ধ দিয়ে দুদিকে ভাগ করলে মৃতও জীবিত হয়ে উঠবে।

পত্রাঘাত

রত্না রাঁচীতে ওর মনিকাকার বাড়ী বেড়াতে গিয়েছে। পাপু মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। একদিন এক পোষ্টকার্ডে দিদির পৌঁছসংবাদ এল। ওর মা তখন পাশের বাড়ীতে ছিলেন। পিয়ন তাঁর হাতেই চিঠিটা দিল। সে বাড়ীর মেয়ে স্বপ্নাও চিঠিটা ঘরে নিয়ে গিয়ে পড়ল। ওর মা বাড়ী ফিরে এলে পাপুও চিঠিখানা পড়ল। কিন্তু চিঠি পড়ে পাপু একেবারে হতভম্ব। পোষ্টকার্ডের উল্টোপিঠে পরিস্কার লেখা-পাপুকে ভাল খাবার দিওনা, ও যেন বোরোক্যালেণ্ডুল না মাখে, ব্যাডমিণ্টন ও ফেদার না ধরে... ইত্যাদি। পাপু ভেবেই পেল না দিদি হঠাৎ এমন অমানুষ হয়ে গেল কী করে ও একেবারেই চুপসে গেল। মুখে কথাটি নেই। পরদিন আমি শুধু বললাম; 'চিঠিটা একটু ভাল করে উল্টে পাল্টে দেখতো।' পাপু সচকিত হয়ে চিঠিটা দেখল তারপর এক দৌড়ে পাশের বাড়ী চলে গেল। স্বপ্নাকে গিয়ে বলল, 'পোষ্টকার্ডে তুই এসব কথা লিখে দিয়েছিস।'

পরীক্ষা

পরীক্ষা বিশেষ করে জীবনের প্রথম পরীক্ষা নিয়ে বিভিন্ন শিশুর ধারনা বিভিন্ন রকম। প্রথমে রত্নার কথাই বলা যাক। সবে নার্সারীতে ভর্তি হয়েছে। কদিন পরেই ওর মা বললেন, 'তুই যে পড়াশুনায় গা করছিস না, পরীক্ষা যে এসে গেল সে খেয়াল আছে?' ও নিস্পৃহভাবে বলল, 'কী আর পরীক্ষা হবে এখনও প্যাণ্ডেলই বানায়ই নি।'

* * *

সানুর ধারনা আর একটু অন্যরকম। একদিন নার্সারী স্কুল থেকে বাড়ী দিয়ে এলে জেঠা ডাক দিলেন। সানু চীৎকার করে জানাল,'আমি আসতে পারব না, আমার পরীক্ষা।' কবে পরীক্ষা জিজ্ঞেস করা হল। সানু জানাল,'সামনেব মাসের বার

তারিখে।' জেঠা বললেন,' সে তো এখনও মাসখানেক বাকী।' সানু সেকথার কোন জবাব দিল না। পায়েলকে সঙ্গে নিয়ে এক দৌড়ে খেলতে চলে গেল।

* * *

আমরা যে আমলে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছি তখন পরিবেশটাই ছিল অন্যরকম। ছিল সহজ সরল জীবনযাত্রা। স্কুলের সময় হলে একটা সুতীর সার্ট গায়ে চাপিয়ে খালি পায়ে স্কুলে রওনা হতাম। তখনও টেরিলীন, টেরীকট, জটার, ডটপেন, ট্রানজিসটার রেডিও, টিভি, জেরক্স, কমপিউটার, এস-টি-ডি ইত্যাদি কোন কিছুই চালু হয়নি। পেনের ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত। একমাত্র পরীক্ষার সময় পেন ব্যবহার করতাম, অন্য সময়ে কালি কলম দিয়ে লিখতাম। নার্সারী স্কুল কোথাও দেখিনি। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল তবে কড়াকড়ি কোথাও ছিলনা। এমনিতে ছেলেরা সারাদিন মার্বেল, লাট্টু, চাকতি ও ডাণ্ডাগুটি খেলা নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাকত। যাই হোক এবারে মূল প্রসঙ্গে চলে আসি। বাড়ীর অদূরেই ছিল প্রাথমিক স্কুল। ঝুণ্টুকে প্রথমে সেখানে ভর্তি করান হল। কিন্তু ক্লাস আর করা হোত না। যে স্কুলে দিয়ে আসতে যেত তারই পিছু পিছু ও চলে আসত। অবশেষে ভাইবোনেরা মিলে পরামর্শে বসল। এক বুদ্ধি বের করা হল। মেয়েদের স্কুল সকালে বসত এবং এক দিদি সেই স্কুলে পড়ত। সে ঝুণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে যেত এবং ওকে ওর স্কুলে দিয়ে নিজের বিদ্যালয়ে চলে যেত। ফলে ঝুণ্টুর বাড়ী ফিরে আসার উপায় রইল না। এর বছর দুই পরে পিণ্টু এবং ওর মামাত ভাই তরুন একসাথে শিশুশ্রেনীতে ভর্তি হল। কিন্তু দুজনেরই গাছাড়া ভাব দেখে আমরা তাজ্জব বনে গেলাম। দেখতে দেখতে পরীক্ষা ও এসে গেল। পিণ্টুকে কটা থেকে পরীক্ষা শুরু জিজ্ঞাসা করা হল। ও জবাব দিল, 'বলেছে তো সাতটায়, কিন্তু কখন আরম্ভ হবে ঠিক নেই।' আমরা বিস্মিত হলাম। ও নিজের ধারনার স্বপক্ষে জানাল, 'সেদিনও বলেছিল সাতটায় পতাকা উত্তোলন কিন্তু পতাকা উঠান হল তো অনেক পরে।' তরুন আবার এক কাঠি উপরে। পরীক্ষার দিন আধঘণ্টার মধ্যে খাতা জমা দিয়ে বাড়ী দিয়ে এল। সগর্বে জানাল,'সব লিখেছি।' জেরা করে জানা গেল প্রশ্নপত্রের কথাগুলো হুবহু খাতায় লিখে খাতা জমা দিয়েছে।

* * *

তিস্তা দাদুর কোলে চেপে জীবনের প্রথম পরীক্ষা দিতে চলেছে। মাকে এবং ঠাকুমাকে প্রণাম করল কিন্তু দিদিকে প্রণাম করতে কিছুতেই রাজী হল না। বলল,'দিদির পরীক্ষার সময়ে দিদি আমাকে প্রণাম করেনি কেন?'

ডায়েট কন্ট্রোল

আরশী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছে। সিঙারা আনা বলে পাঁচখানা সিঙারা খেল। বলল, 'আমি আটখানা সিঙারা খেতে পারি।' রাতে

ডিম রান্না করা হবে শুনে বলল, 'আমি ডিম আর আলু খাইনা, ডায়েট কন্ট্রোল করছি।'

উসুল

কয়েকজন ছাত্র একজন শিক্ষকের কাছে কোচিং পড়তে যেত। তিনি মেঝেতে মাদুর পেতে দিতেন—ছাত্ররা সেখানেই বই খাতা নিয়ে বসত। পাশে খাটের উপর পরিপাটি করে বিছানা পাতা থাকত কিন্তু তিনি ছেলেদের সেখানে বসতে দিতেন না। একদিন শিক্ষক মশায়ের কাছে কেউ ফোন করেছিল। তিনি ফোন ধরতে দোতলা থেকে একতলায় নামলেন। সেই অবসরে ছাত্ররা এক এক করে খাটে উঠে গড়াগড়ি দিয়ে নিল।

বাধা

শিক্ষকমশায় ব্ল্যাকবোর্ডে জ্যামিতির ক্লাস নিচ্ছেন। একটি ছাত্র হাত তুলল। শিক্ষক মশায় বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এখন নয়'। একটু বাদে সে পুনরায় হাত তুলল। এবারেও সে ধমক খেল। শিক্ষক মশায় নিজের কাজ শেষ করে ছাত্রটির দিকে ফিরে বললেন, 'এবারে বল কী বলছিলে?' সে বলল, বলতে চেয়েছিলাম বোর্ডের লেখা দেখতে পাচ্ছিলাম না, আপনার মাথা আড়াল পড়ছিল।'

বিশ্বকাপ

১৯৯০ সালে ইটালীতে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে। পাপুর বিদ্যালয়েও তার প্রতিফলন পড়েছে। একজন নূতন শিক্ষক বিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। ছেলেরা ক্লাসে গোলমাল করাতে তিনি বুকপকেট থেকে হলুদ কার্ড বের করে একটি ছাত্রকে নীলডাউন করালেন, আবার লাল কার্ড দেখিয়ে অপর একটি ছাত্রকে ক্লাসঘর থেকে বের করে দিলেন।

দুঃখু

শিক্ষকমশায় বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের কথা বলতে গিয়ে বললেন, 'তারা মৃত্যুর পরোয়া করত না। মৃত্যু তো একদিন আসবেই।' এই বলে তিনি নিজের প্রসঙ্গ টানলেন, 'এই যে আমি সোদপুরে থেকে কখনও ট্রেনে, কখনও বা বাসে এখানে আসি তারপর রিকসা করে স্কুলে আসতে হয়—যে কোন সময়েই তো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

পেছনের বেঞ্চ থেকে একটি গলার আওয়াজ শোনা গেল,' আর বলবেন না স্যার, আমাদের দুঃখু লাগে।'

তুই কে

বিদ্যালয়ে ক্লাস চলছে। এর মধ্যে আকাশ কালো করে বৃষ্টি শুরু হল। ঘন ঘন বাজ পড়তে লাগল। পরমুহূর্তেই লোডশেডিং। ক্লাস একেবারে অন্ধকার। এমন সময় একটি ছাত্র ক্লাসে ঢোকার অনুমতি চাইল। শিক্ষকমশায় বললেন, 'আগে দেখি তুই কে?' তারপর ছেলেটিকে বারান্দায় রেলিং এর ধারে নিয়ে গিয়ে মুখ দেখে বললেন, 'এবারে ক্লাসে ঢোক'।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার

ওয়ার্ক এডুকেশানের ক্লাস চলছে। একজন ছোকরা শিক্ষক একটি ছাত্রের চুলের মুঠি ধরে বললেন, 'এই তুই উঠে আয়, তুই প্রথম বেঞ্চে বসার উপযুক্ত নোস। একেবারে লাষ্ট বেঞ্চে গিয়ে বসবি।' ছেলেটি অনুনয় করল, 'এক মিনিট চুলটা ছাড়ুন স্যার, দেখি কার পাশে বসব।' পিরিয়ড শেষ হলে তিনি ছেলেটিকে বললেন, 'এবারে নিজের জায়গায় চলে যা'। ছাত্রটি বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।' ছোকরা শিক্ষক ফিক করে হেসে ফেললেন।'

চিন্তা ভাবনা করে লেখা

পরীক্ষা চলছে। প্রশ্ন এসেছে—শুদ্ধ করে লেখ 'কোনে পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ হলে তারটিকে ঘিরে একটি চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, একে অ্যাম্পিয়ারের সন্তরন সূত্র বলে'। একটি ছাত্র সঠিক উত্তর ভুলে যাওয়াতে যে শিক্ষক গার্ড দিচ্ছিলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করল। তিনি প্রচন্ড রেগে গিয়ে বললেন, 'এরি মধ্যে ভুলে গেলি ওটা ওরেষ্টেডের সন্তরন সূত্র। চিন্তা ভাবনা করে লেখ।'

বলিনি

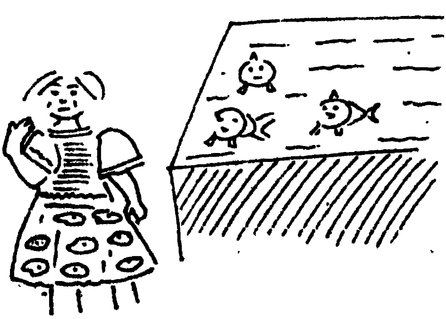
এক আধপাগলা শিক্ষক গার্ড দিচ্ছেন।'এক পরিক্ষার্থী জিজ্ঞেস করল; 'স্যার এই translation টা ধরতে পারছিনা—সে যতক্ষন ঘুমায় ততক্ষন রাত মনে করে। 'এটা কি when দিয়ে শুরু করব?' তিনি বললেন, 'উঁহু'। ছাত্রটি বলল, 'তাহলে so long দিয়ে?' তিনি বললেন 'ঠিক ধরেছ।' অন্য এক পরীক্ষার্থী প্রতিবাদ জানাল। তিনি বললেন, 'আমি তো নিজে কিছু বলিনি। ও নিজেই সব বলেছে।'

পাজী ছেলে

ক্লাসে এক শিক্ষক মশায় ছিলেন একেবারে কাছাখোলা। একদিন একটি ছাত্রকে কোন অপরাধে ক্লাস ঘর থেকে বের করে দিলেন। ছাত্রটি বিনা প্রতিবাদে বের হয়ে গেল। কিন্তু মিনিট কুড়ি বাদেই তিনি দেখতে পেলেন সে ছেলেটি দিব্যি ক্লাসে বসে আছে। তিনি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন. 'তোকে কে ঢুকতে দিল?' ছেলেটি অম্লান বদনে জানাল 'আপনি স্যার।' ক্লাসের ছাত্ররা একবাক্যে জানালে ও একবিন্দু মিথ্যে কথা বলেনি— আপনার কাছ থেকে পারমিশান নিয়েই ও ক্লাসঘরে ঢুকেছে।' শিক্ষক মশায় কোন জবাব খুঁজে পেলেন না। তিনি কখন অনুমতি দিয়েছিলেন নিজেই জানেন না।

বোকা মাছের গল্প

আমার বাড়ীর সামনেই আছে একটি পাকা ড্রেন। বর্ষাকালে সেখানে পুকুর থেকে অনেক মাছের পোনা চলে আসে। পাড়ার ছোট বাচ্চারা ঝুড়ি নিয়ে সেই সব মাছ ধরত। আমার মেয়েকেও কিছু মাছের পোনা দিয়েছিল। চৌবাচ্চাতে সেগুলোকে রাখা হল। কিন্তু দুদিন পরে সেই মাছ নিয়ে আর কারো উৎসাহ রইল না। আমাকেই জল পালটাতে হয়, সেগুলিকে খাবার দিতে হয়। শেষে বিরক্ত হয়ে একদিন বললাম, 'বাবাইকে মাছগুলো দিয়ে দেব। ও কূয়োতে ছাড়বে বলেছে।' কিন্তু আমার মেয়ে



বাধা দিল। বলল, 'ওদের কথায় বিশ্বাস নেই, ওরা নিজেরাই মাছগুলো খেয়ে নেবে।' দুদিন বাদে আবার বললাম, 'তাহলে পার্থদের ডোবাতে এগুলোকে ছেড়ে দিয়ে আসি।' ও বলল, 'ওখানে ঢোড়া সাপ আছে। সাপে ওদের খেয়ে নেবে।' অগত্যা একদিন মাছগুলোকে এক বালতিতে তুললাম। বললাম, 'পুকুরে ছেড়ে দিয়ে

আসি।' আমার মেয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, 'বোকা মাছগুলোকে লোকে বঁড়শি দিয়ে তুলে নেবে।'

স্টপ

দিন দশেক হল পাপু কলেজ স্কোয়ারে একটি সাঁতারের ক্লাবে ভর্তি হয়েছে। এতদিনে সাঁতারের কিছুই শেখেনি তবে জলে নামার আগে ট্রেনার দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষার্থীদের পি টি করান। ওরা তাতেই ক্লান্ত হয়ে পরে। একদিন এইরকম পি টি চলছে। চলছে তো চলছেই থামার কোন লক্ষণ নেই। হঠাৎ দীর্ঘ প্রতিক্ষিত অর্ডার—স্টপ। সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস নিল। কিন্তু সব ছাপিয়ে ট্রেনারের গলা শোনা গেল—'কে বললে কথাটা?'

ড্রাইভিং

স্কুলের পরীক্ষা শেষ হলে কলেজে ভর্তি হবার আগে ছাত্ররা কয়েক মাস সময় হাতে পায়। সে সময়ে কেউ স্পোকেন ইংলিশ, কেউ কমপিউটার, কেউ টাইপিং ইত্যাদি শিখে নেয়। শোনা গেল একটি ছেলে মোটর ড্রাইভিং শিখছে। বন্ধুরা দল বেধে ওর বাড়ীতে গিয়ে হাজির। জিজ্ঞেস করল, 'তুই কোথায় শিখছিস, কখন শিখিস ইত্যাদি।' সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?' সকলে একসংগে উত্তর দিল 'সে সময়ে রাস্তায় বের হব না।'

লাভ-ক্ষতি

পাপুর ক্লাসে একটি ছাত্র ক্লাস শিক্ষকের কাছে বাইরে যাবার ছুটী চাইল। বলল 'পেট খারাপ।' মাস্টার মশায় ছুটী দিতে অস্বীকার করলেন। তখন ক্লাসের অন্য ছাত্ররা ওর হয়ে আবেদন জানাল। বলল 'আগের ক্লাসেও ওকে বাইরে যেতে হয়েছে।' ছুটী সংগে সংগে মঞ্জুর হয়ে গেল। ও বাইরে যাবার আগে পেছন ফিরে চোখ টিপল। পরে দেখা গেল ও ক্লাস পালিয়ে বাইরে ফুটবল খেলছে। ছুটীর পর সেই ছেলেটি বইপত্তর নিতে এসে দেখতে পেল ওর টিফিনের কৌটা খালি। ও এই নিয়ে অভিযোগ তোলার আগেই অন্য ছেলেরা বলল 'তুই টিফিন খাবি কিরে, তোর না পেট খারাপ?'

সুইট হোম

একবার বাড়ীতে মেরামতীর কাজ সুরু হল। সারা উঠান কাঠ, বালি, ইট, পাথরে

ভরে গেল। সব কাজ মিটে গেলে দেখা গেল একটি অনাথ গিরগিটীর বাচ্চা কোনক্রমে সেই ভগ্নস্তুপের মধ্যে টিকে রয়েছে। সেটি ঘর সংলগ্ন এক তুলসীগাছে আশ্রয় নিল এবং অনেক বেলা অবধি ঘুমিয়ে থাকত। রত্না পরম সমাদরে এই বাচ্চাটিকে গ্রহণ করল এবং এক মুহূর্ত দেখতে না পেলে ব্যস্ত হয়ে উঠত। দেখতে দেখতে শীত এসে গেল। রত্না তুলসীগাছ সংলগ্ন দেয়ালে আধখানা নারকেলের মালা উল্টে একটা ঘর বানিয়ে দিল এবং ভেতরে তুলার গদিও বাদ গেল না। একদিন ভোরে ঘুম ভাঙতে দেখা গেল বাচ্চাটি সেই ঘরে গভীর নিদ্রামগ্ন। সেদিন বাড়ীতে যে কী আনন্দ হয়েছিল তা বলে বোঝান সম্ভব নয়।

অবিশ্বাস্য

বুটুন বাঘাযতীনে থাকে। ও এখানে এলেই ছোটদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায় এবং মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ওর কথা শোনে। বাঘাযতীনে নাকি অদ্ভুদ সব ঘটনা ঘটে। এমনকি ওদের ফুটবল খেলাও প্রচলিত নিয়মে চলে না। একদিন কালো আর ধলাদের মধ্যে খেলা হলে পরের দিন বেটে আর লম্বাদের মধ্যে খেলা হয়ে থাকে। অন্যদিন ব্যাক বেঞ্চারদের সংগে টপারদের খেলা। এইভাবেই খেলা চলতে থাকে।

১১ই আগস্ট ১৯১১ তারিখে সূর্যগ্রহণের দৃশ্য সরাসরি দূরদর্শনে প্রচার করা হয়েছিল। সে সময়ে নাকি অনেকে চোখে সোলার ফিলটার লাগিয়ে দূরদর্শনে সেই গ্রহণের দৃশ্য দেখেছিল।

স্বখাত সলিলে

বাড়ীতে পূজার্চনার জন্য তুলসীপাতার প্রয়োজন হয়। আমার বৃদ্ধা মা তাই বাড়ীতে তুলসীচারা পুঁতেছেন—তবে একটি বা দুটি নয় যত্র তত্র। নিয়মিত সেই চারাগুলিতে জল দেওয়া হত। তবে এর ফল ভাল হয়নি। দেখতে দেখতে সেই চারাগুলি ডালপালা ছড়িয়ে যাতায়াতের পথ আটকে দিল। শুধু তাই নয় যেটুকু জমি ফাঁকা ছিল সেখানে সেই গাছগুলির ছায়া এসে পড়ত। যাতায়াত করতে হলে গাছে পা লাগত বা ছায়া মাড়াতে হত। একজন নিষ্ঠাবান বিধবা মহিলার পক্ষে সেভাবে চলা ফেরা করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি সারাদিন বিরস মুখে ঘরে এসে বসে থাকতেন—শুধু সকাল বা সন্ধ্যায় বের হতেন।

সিনেমা সিনেমা

কোন নূতন সিনেমা রিলিজ হলে তার টিকিট সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু বুটুনের কাছে সেটি কোন সমস্যাই নয়। সে বলে, 'টিকিট কাটার প্রয়োজন

হলে আমি বিপুলকে ডেকে পাঠাই।' বিপুলের চেহারা বিশাল ও কালো কুচকুচে। দেখলেই মনে ভয় জাগে। বিপুল এলেই বলা হয়, 'জামা খোল।' তারপর ওর হাতে টাকা ধরিয়ে দিয়ে টিকিট কাউন্টারের সামনে ভীড়ের কাছে দাড় করিয়ে পেছন থেকে বন্ধুরা ঠেলতে থাকে। তারপর একসময়ে সে ভীড়ের আবর্তে ঢুকে যায়। পরমুহূর্তে সে টিকিট কেটে হাসিমুখে চলে আসে।

লোভী

বিদ্যালয়ে একবার বিতর্কের বিষয় ছিল নিরামিষ বনাম আমিষ। দেখা গেল নিরামিষ প্রেমীদের যুক্তিজালে আমিষ প্রেমীরা একেবারে কোণঠাসা হয়ে গেল। নিরামিষ প্রেমীরা একতরফাভাবে জিতে গেল। বিতর্কের পরেই কিঞ্চিৎ জলযোগের বন্দোবস্ত। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহাশয় বললেন, 'আমিষ নিরামিষ দুরকম আহার্যের বন্দোবস্ত আছে। কারা নিরামিষ খেতে চাও হাত তোল।' কিন্তু দুঃখের বিষয় একটি হাতও উঠল না।

নকসা

ক্লাসে এক ছোকরা শিক্ষক নূতন এসেছেন। ইতিহাসের কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন লিখিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন সেই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত কথাবার্তা ঃ

—আমি যে সব প্রশ্ন লিখিয়ে দিয়েছিলাম, তাতে তোমাদের উপকার হয়েছে কি?

—স্যার সে কথা বলতে হবে কেন, আমাদের সেকশন থেকে এবারে প্রথম হয়েছে।

—আমি ভাল ছেলেদের কথা বলছিনা। সাধারণ ছেলেরা ভাল করে বুঝতে পেরেছ তো?

—স্যার বাংলাতে লেখা এ আর বোঝাবুঝির কী আছে?

পাশ থেকে অন্য একটি ছাত্র মন্তব্য করল—স্যার ও ঠিকই বুঝেছে, শুধু আপনার সঙ্গে নকশা করছে।

শুভাকাঙ্খী

রত্না তখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। সোদপুরে এক বিদ্যালয়ে সীট পড়েছে। একজন মহিলা তাঁর মেয়েকে ওর পাশে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ে তোমার পাশে বসল, যা না পারে একটু বলে দিও।'

জব্দ

এককালে কুচবিহারের এক শহরে থাকতাম। বেশ কিছুটা জায়গা জমি নিয়ে ঘর বাড়ী ছিল। একবার লোক লাগিয়ে সেই জমিতে কচু গাছ বুনে দেওয়া হল। দেখতে দেখতে সেই গাছ বড় হয়ে গেল। একদিন শুধু ঝন্টুকে বাড়ীতে একা রেখে বাড়ীর লোকজন বাইরে গিয়েছে। ইতিমধ্যে একপাল শূকর ঢুকে সমস্ত কচুগাছ তছনছ করে দিল। বাড়ীর লোকেরা বাড়ী ফিরে এসে ঝন্টুকে বলল, 'তুই দেখিসনি?'



ও বিজ্ঞের মত জবাব দিল, 'দেখেছি তো কিন্তু কিছু বলিনি—কত খাবে খাক না, পরে গলা চুলকালে টের পাবে।'

সমীহ

পুঁচকে অরুণ তখন সামান্য লেখাপড়া শিখেছে। কিন্তু ওকে নিয়ে মুস্কিল হল কাউকেই তোয়াক্কা করে না। ভয় ডর বলতেও কিছু নেই। একদিন ওর সামনে একটি খবরের কাগজ মেলে ধরলাম। সেখানে উল্লেখ আছে কোন এক গ্রামের এক চৌকিদারের অসমসাহসিকতার জন্য এক ডাকাত ধরা পড়েছে। এই খবরের বিশেষত্ব এইটুকু যে চৌকিদারের যেই নাম, আমারও ঠিক সেই নাম। অরুণ আমার সেই অসম সাহসিকতা দেখে একেবারে তাজ্জব বনে গেল। সেই থেকে কিছুদিন আমাকে সমীহ করে চলত।

ফকির

মাস শেষ হবার আগেই রত্না ও পাপু ওর বাবার কাছে খোঁজখবর নিতে আসে

টাকা পয়সা লাগবে কি না। যদি বলা হয়, 'কষ্ট করে কটা দিন চালিয়ে নেব' তাহলে ওরা সন্তুষ্ট হয় না। জোর করে বাবার হাতে টাকা ধরিয়ে দেয়, তারপর মাস পড়তেই চড়া সুদে সেই টাকা শোধ করতে হয়। ওর বাবা দুঃখ করেন, 'আমার টাকা আমার কাছে সুদে ধার খাটিয়ে ছেলেমেয়ে বড়লোক হয়ে গেল, আর আমি যে ফকির ছিলাম সেই ফকিরই রয়ে গেলাম।'

বাটপারি

ছোটবেলায় দেশগাঁয়ে থাকতাম। পাশের বাড়ীতে এক বৃদ্ধ হুঁকায় তামাক খেতেন। আমরা দুই ভাইবোনে মিলে কলকেতে ব্যবহৃত গুল সংগ্রহ করতাম এবং মাঝে মাঝে সেই গুল দিয়ে দাঁত মাজতাম। আমাদের ছোটবোন অঞ্জলী সবকিছু নজর রাখত কিন্তু মুখে কিছু বলত না। একদিন সকালে কী ঘটেছিল জানি না কিন্তু দেখা গেল অঞ্জলীর দাঁতগুলো তরমুজের বীচির মত কালো কুচকুচে। অবশেষে জেরা করতে আসল ঘটনা জানা গেল। এ লুকিয়ে দিদির সংগ্রহ করা গুল ব্যবহার করতে গিয়েছিল কিন্তু সেখানে গুল ছিল না, ছিল পারমাঙ্গানেট অব পটাস।

পৃথক ফল

চন্ডীমামাকে আমি আদপেই দেখিনি তবে আমার সহকর্মী সুহাসের মুখে তাঁর নাম অনেক শুনেছি। তিনিও আমাদের মতই সাধারণ মানুষ কিন্তু একটি ঘটনাই তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত করে তুলেছিল। পাড়ার এক বৌদির দাঁত তোলা প্রয়োজন। চন্ডীমামা সঙ্গে গেলেন। হাসপাতাল থেকে যখন দুজনে ফিরে এলেন তখন ভিন্ন চিত্র। দেখা গেল রিক্সাতে দুজনে বসে আছেন বটে তবে চন্ডীমামা অসুস্থ। বৌদি দুহাতে চন্ডীমামার মাথাটা ধরে আছেন। পাড়ার ছেলেরা ধরাধরি করে চন্ডীমামাকে ঘরে পৌঁছে দিলেন। পরে চন্ডীমামার অসুস্থ হবার আসল কারণ জানা গেল। বৌদির দাঁত তোলার সময় তিনি জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছিলেন। সেই দৃশ্য দেখেই তিনি ভিরমী খান।

বিনা মন্তব্যে

খুদে পাপু— গোবর দিয়েও ঘুঁটে দেওয়া যায়।

*　　　*　　　*

খুদে রত্না— মশারা রাতে ঘুমোয় না।

আফিস কর্মী (রেগে গিয়ে)— তোমাকে সোজা বাংলায় বলতে হয় স্টুপিড।

* * *

পাড়ার দাদা— কী রে গোবিন্দ তোর বাড়ীতে কুকুরছানাগুলো চেচাচ্ছে কেন- ওরা কি আর মানুষ নয়?

* * *

লালগোলার ট্রেনে গার্ড এর কামরার বাইরে চক দিয়ে লেখা— মামা

* * *

কচি হাতে লেখা বিজ্ঞপ্তি— ঘর ভাড়া দেওয়া হয়। লোকের কথায় কান দেবেন না। ভেতরে খোঁজ করুন, ভয়ের কিছু নেই।

* * *

আর একটি বিজ্ঞপ্তি— এখানে পেচ্ছাব করবি না।

* * *

শিক্ষক তারাপদ দত্ত মশায়ের নামকরণ— তামাক পান দোক্তা।

* * *

একটি ছাত্রীদের হস্টেলে একটি ঘরে দেয়াল লিখন— This is Aitreyee's Dream world. Bed sweet bed.

* * *

লোকাল ট্রেনে শশা বিক্রেতা— ছাল ছাড়িয়ে নূন দিয়ে দেব। দাম মাত্র চারআনা।

* * *

কোলকাতার একটি দ্রষ্টব্য— ট্রাম কোম্পানীর বাস।

* * *

দেশে পরিবার পরিকল্পনা— দুই এর পর আর নয়।

* * *

একজন গবেষকের মন্তব্য— স্যার, এ বছর মেয়েদেরই বেশী বিয়ে হচ্ছে।

* * *

একজন প্রথম সারির লেখকের উক্তি— প্রত্যেক লোকেরই বিয়ে করা দরকার। সব দোষ তো বামফ্রন্ট সরকার আর কেন্দ্রের উপর চাপান যায় না।

* * *

গৃহিনী (কাজের মেয়েকে)— ভাল করে কাজ করবি, বললাম তো সরি ম্যাডাম দেব।

* * *

একজন ছাত্রের স্মৃতিচারণ— স্কুলে ফোর্থ বেঞ্চে বসতাম। একদিন পড়া জিজ্ঞেস করাতে এমন কেঁদেছিলাম যে স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল।

নেপথ্যে

বাপন ও তুলী পিঠাপিঠি ভাইবোন। দুজনেই ভীষণ হাসিখুশী এবং খুব মিশুকে। কিন্তু হলে কী হবে তুলী কাছে এলেই বাপন একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়। তখন সে অতিমাত্রায় গম্ভীর, মাপা কথা বলে এবং সুযোগ পেলেই একটু করে দাদাগিরি ফলায়। অযথা যাতে সময়ের অপব্যবহার না হয় সেদিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। সে যখন বাইরে যায় তখন নিজের ওয়াকম্যান ও গানের ক্যাসেট তালাবন্দী করে রেখে যায়। কিন্তু তা নিয়ে তুলীর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। কারণ তুলীরও নিজস্ব ক্যাসেটের সংগ্রহ আছে। সময়ে অসময়ে বাবার স্টিরিও নিয়ে গান শোনে। তবে বাপন ও তুলী দুজনেই গান শুনতে প্রচণ্ড ভালবাসে এবং এই সংগীত প্রেম উভয়ের মধ্যে অনেক বাধানিষেধের বেড়াজাল আলগা করে দিয়েছে। বাপন বোনকে শাসন করলেও কখনই চায়না তুলীর গান শোনা বন্ধ হয়ে যাক। লোকচক্ষুর অন্তরালে বাড়ীতেই রমরমা ক্যাসেটের ব্যবসা। হিট্ গানের ক্যাসেট বের হলেই বাপন তা কিনে আনে এবং দুদিন পরেই আবার তা বিক্রী করে দেয়। না না খদ্দের নিয়ে ভাবতে হয় না। তুলীই সমস্ত ক্যাসেট কম দামে কিনে নেয়।

চিরঋণী

ইনজিনীয়ারিং কলেজের একজন চাত্র তার এক সহপাঠীর কাছ থেকে চারশ টাকা ধার নিয়েছিল। কিছুদিন পরে দুজনে মুখোমুখি দেখা। কী কথাবার্তা হয়েছিল তাই শুনুন—

ঃ শুনতে পেলাম তোর নাকি আজকাল মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়।

ঃ যথার্থই শুনেছিস। তবে তোকে যে টাকা ধার দিয়েছিলাম তা ঠিক খেয়াল আছে।

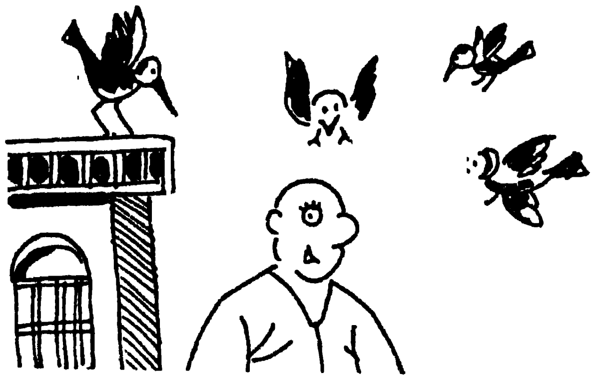
ঃ তুই যে টাকা দিয়ে কী উপকার করেছিস তা আমি জীবনে ভুলব না। তোর ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না।

ঃ উপকারের কথা ভুললে ক্ষতি নেই তবে টাকাটা ফেরৎ দিতে দেরী করবিনা।

ঘোঘের বাসা

বিশ্বাস করবেন কি না জানি না আমাকেই আমার বাড়ীতে অতি সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। কারণ কয়েকটি কাক আমার জীবন একেবারে দুর্বিষহ করে তুলেছে। ঘর সংলগ্ন এক নারকেল গাছে দুটি কাক বাসা বানাবার আয়োজনে রত ছিল। এর জেরে আমার বাড়ীর একটি ঝাটাও আর আস্ত রইল না। আমি খুব বিরক্ত

হয়ে একজন গাছী ডেকে আনলাম। বাসাটি ভেঙে লাভ মন্দ হয়নি—কয়েকটি মেটালের চুড়ী, হেয়ারব্যান্ড, তারের হ্যাঙ্গার. ক্লীপ এবং হাফ কেজির মত তার মিলল। কিন্তু এর ফল ভাল হয়নি। আমাকে দেখতে পেলেই কাকেরা উত্তেজিত হয়ে ডাকতে সুরু করে এবং তারপর সংঘবদ্ধভাবে আক্রমন করে। ফলে বিনা বৃষ্টি বাদলে আমাকে ছাতা মাথায় দিয়ে আমার বাড়ীতেই চলা ফেরা করতে হয়। আমি



কাককে জব্দ করতে পারিনি কিন্তু আমার সহকর্মী স্বদেশ পেরেছিল। সে কাকের বাসা ভেঙে পরমুহূর্তে সেলুনে গিয়ে মাথা ন্যাড়া করে এসেছিল। ফলে কাকেরা হাজার চেষ্টা করেও আসল অপরাধীকে সনাক্ত করতে পারেনি।

মুস্কিল আসান

একদিন মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় করে আফিসে গিয়ে হাজির হলাম। সকলেই কাকভেজা হয়ে আফিসে এসেছে। সকলেই চা খেতে আগ্রহী। ছেলেমানুষ পিয়নটির কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু তার জামাও ভেজা। তখন অন্য একজন তাঁর গায়ের সার্ট খুলে দিলেন। পিয়নটি সেই সার্ট গায়ে দিয়ে চা আনতে চলল।

দাদার কীর্তি

আমার এক আত্মীয় বাংলাদেশে থাকেন। তার মত হুজুগে লোক দেখা যায় না। একবার ঠিক করলেন এদেশে চলে আসবেন। ভেবে চিন্তে এখানে লেপ পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু আদৌ এলেন না। শীত এলে সকলের টনক নড়ল। আবার নূতন লেপ বানাতে হল। এখানে ছোট ভাইকে বিয়ে দেবেন। লিখলেন, 'পাত্রী দেখেছি।

ফর্সা কিন্তু বেঁটে তাছাড়া সুন্দর নয়। তবে দেবে থুবে অনেক।' আর কাউকে পাত্রী দেখতে বললেন না, ভাইয়ের কাছে ফটোও পাঠালেন না। সোজা পাত্রীর দাদাকে হাতচিঠি দিয়ে ছোটভাই-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি এসে ছোটভাইকে বিনা পাশপোর্টে বাংলাদেশে নিয়ে গেলেন। সে গিয়ে দেখতে পেল সেখানে বিয়ের আয়োজন সুরু হয়ে গিয়েছে। সে পছন্দ অপছন্দ জানাবারও সুযোগ পেল না। তার আগেই বিয়ে হয়ে গেল। পাত্রীর দাদা বৌ সমেত তার ছোট ভাইকে এদেশে দিয়ে গেলেন। অনেক দেয়া থোয়ার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখলাম না।

বেইমানী

শংকর আমার অফিসের পিয়ন। মাথায় একটু ছিটগ্রস্ত তায় আবার নেশা ভাঙ করে। কারণেই নেশার জন্য এর ওর কাছে হাত পাততে হয়। একদিন অফিসের দপ্তরী কানাই-এর কাছে গিয়ে পাঁচটি টাকা ধার চাইল। কানাই টাকা দিতে অস্বীকার করল। শংকর জানাল যে মাস পড়লেই সে টাকা শোধ দিয়ে দেবে। কিন্তু তাতে কাজ হল না। তখন শংকর একেবারে হতবাক হয়ে বলল, 'কানাইদা তুমিও আমার সঙ্গে এরকম বেইমানী করছ। তোমাকে বিপদে আপদে আমি কত সাহায্য করেছি। সেবারে যখন তোমার মা গত হলেন তখনও আমি পাঁচশ টাকা দিয়েছিলাম'। কথাটা কানে যেতেই কানাই মারমুখী হয়ে বলল, 'মুখ সামলে কথা বল, নইলে মুখ ভেঙ্গে দেব।' মুহূর্তে দুজনে হাতাহাতি হবার উপক্রম হল। অন্য সহকর্মীরা এসে ওদের ছাড়িয়ে দিল। কানাই-এর উষ্মার কারণ ওর মা এখনও সশরীরে বর্তমান।

দুই আইন

আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক ছিলেন বেজায় রাশভারী। বাড়ীর সকলেই তাঁকে ভয় করে চলত। সাত সকালে আফিসে রওনা দিতেন, ফিরতেন সন্ধ্যা পার হয়ে। সংসারের কোন খবর রাখতেন না। তাঁর স্ত্রী ছিলেন নিতান্ত ভালমানুষ। ছেলে ও মেয়ে এই পরিস্থিতির পুরো সুযোগ নিত। সারাদিন টো-টো করে ঘুরে সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরে আসত। বাবা এসে দেখতে পেতেন ছেলে মেয়ে পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত। কাউকে দেখতে না পেলে মা কোন অজুহাত দেখাতেন। কদিন পরে হাতে হাতেই এর ফল মিলল। মেয়ে পছন্দমত একটি ছেলেকে বিয়ে করে ফেলল। ভদ্রলোকের পত্নী প্রচন্ড মানসিক আঘাতে শয্যা নিলেন। এক প্রতিবেশী মেয়ে তখন অক্লান্ত সেবাযত্ন করে তাঁকে সুস্থ করে তুলল। মেয়েটির সেবায় তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। পাশাপাশি নিজের হতচ্ছাড়া মেয়ের কথা বলতে গিয়ে তাঁর গলা ধরে এল। তিনি

সুস্থ হতেই পুত্র সবিনয়ে নিজের বিয়ের কথা পাড়ল। মা রাজী হলেন না। বললেন, 'বিয়ে দাও বললেই তো বিয়ে দেওয়া যায় না। পাত্রী দেখে পছন্দ করে তবে তো বিয়ে।' পুত্র এবার স্বমূর্তি ধরল। বলল, 'বোনের বিয়েতে তোমারা আপত্তি করলে না, আর আমি বিয়ে করতে চাইলেই যত দোষ। এক বাড়ীতে সকলের জন্য এক আইন চালু করতে হবে। পাত্রীও তোমাদের খুঁজতে হবে না। সেই মেয়েই তো তোমাকে সেবা যত্ন করে সুস্থ করে তুলল।' ছেলের মতিগতি দেখে ভদ্রমহিলা আবার শয্যা নিলেন।

বেলাইন

আমার পিয়ন শংকরের কথা আগেই শুনেছেন। শংকরেরা তিন ভাই, ও মেজো। একেবারে ছন্নছাড়া সংসার, কারণ সকলেই ব্যচিলার। সকলেরই বেশ বয়স হয়েছে। হঠাৎ একদিন শংকরের দাদা ফাল্গুনীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। শংকরও ধোপদুরস্ত হয়ে নুতন পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরে বরযাত্রী গেল। আমরাও বৌভাতের নিমন্ত্রণ খেয়ে এলাম। শংকর আফিসে এলে ওকে বলা হল, 'এবারে তোমার লাইন, দাদাকে বল।' আমাদের প্রস্তাব শুনে শংকর খুবই খুশী হল। বলল, 'আমি কোনদিনই দাদাকে সে কথা বলতে পারব না। তবে দাদা যদি আমার বিয়ে দিতে চায়, আমি আপত্তি করব না।'

কিন্তু কদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল শংকরের সেই আগের মত ছন্নছাড়া চেহারা। ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। ছোট ভাই সম্বন্ধে অভিযোগ জানাল, 'যে ভাইকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, সে এখন সকলকে বলে বেড়াচ্ছে ও নাকি আমার চাইতে বড়।'

লাইন

পুজোর সময় রেশনের দোকানে বেজায় ভীড়। এক বৃদ্ধ মিনিট খানেকের জন্য লাইন ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে নিজের জায়গা নিয়ে আরেক বৃদ্ধের সংগে তর্ক বেধে গেল। তাদের বক্তব্য নিম্নরূপ :

১ম বৃদ্ধ— এই ছেলেটির পেছনে আমার লাইন।

২য় বৃদ্ধ—হতেই পারে না। আমি সুরু থেকে এই ছেলেটির পেছনে দাড়িয়ে আমি। আপনি দশজনকে জিজ্ঞেস করুন।

১ম বৃদ্ধ— তাহলে বোধ হয় ওর আগে ছিলাম।

২য় বৃদ্ধ—তাই বলুন-যুক্তিতে আসুন।

নিকাল যাও

সেবারে এক ভাগ্নের বিয়ে উপলক্ষে পাটনাতে গিয়েছি। জামাইবাবু সেখানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। ভাগ্নে ভাগ্নী ও আত্মীয় পরিজনদের সংখ্যা কম নয়। বিয়ে পার হয়ে বৌভাত এসে গেল। ছাদে বিশাল প্যান্ডেল করে আহারের আয়োজন। সন্ধ্যা হতেই এক এক করে গাড়ীতে ও স্কুটারে চড়ে নিমন্ত্রিতরা আসতে সুরু করলেন। আমি এক ভাগ্নেকে সংগে নিয়ে সদর ফটকে অতিথিদের রিসিভ করে ভেতরে



পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু মুস্কিল কাউকেই চিনি না। একটু পরেই হাতে হাতে ফল পাওয়া গেল। চন্ডীদা এসে জানালেন অতিথিদের সংগে মিশে বেশ কিছু উটকো ছেলে খাবার খেয়ে চলে এসেছে। তাঁর ধমক খেয়ে বাইরে অপেক্ষারত কিছু সুযোগসন্ধানী ছেলে দৌড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু ভাগ্নে বাচ্চুর হাতে একটি ছেলে ধরা পড়ল। সে বাড়ীর ভেতর থেকে ঘাড় ধরে ছেলেটিকে বাইরে নিয়ে এল। জোরাল আলোর সামনে ছেলেটিকে আনতেই রত্না চেচিয়ে উঠল, 'বাচ্চুদা কর কী, এ যে রান্নার ঠাকুরের ছেলে।'

ইন্ডিয়া

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী হলেও আমাদের সম্বন্ধে সেখানকার সাধারণ লোকের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। ঢাকার অদূরেই আমার এক আত্মীয় থাকতেন। একবার অরুণ সেখানে গেল। ইন্ডিয়া থেকে লোক এসেছে শুনে কৌতূহলী গ্রামবাসীরা দেখতে এল। এক চাষী বৌ অরুণের কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলল, 'এ যে বাংলাতে কথা কয়।'

নেহী চলেগা

দীর্ঘদিন আগেকার কথা। এক বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার চালু হবার সম্ভবনা। কর্মচারীরা তাই রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে যাতে রাতের অন্ধকারে তা না ঢুকতে পারে। অটোমেশানের বিরুদ্ধে চারিদিকে পোস্টার পড়ল। সকালে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা এক বিক্ষোভ মিছিল বের করল। পথচারীরা সেই মিছিলের শ্লোগান শুনে হতবাক। একজন বলছে 'আটা মেশিন', অন্যরা সমস্বরে জবাব দিচ্ছে 'নেহি চলেগা'।

পরনিন্দা

কথায় বলে পরনিন্দা পরচর্চা করিও না। কিন্তু সে শুধু কথার কথা। ঠেকায় পড়লে নিজেদেরও নিন্দা করার প্রয়োজন হয়। এবারে সেই কথা শুনুন। আমার এক আত্মীয়া প্রবাসে থাকেন। তার এক পুত্র তখন স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠরত। হঠাৎ সে বিয়ে করবে বলে জিদ ধরল। পাত্রী ক্লাসের এক সহপাঠিনী। কিন্তু মেয়েটি অবাঙালী। ফলে উভয় পরিবারই বিব্রত হয়ে পড়ল। কিন্তু মুস্কিল হল উঠতি বয়সী ছেলেমেয়েদের আজকাল বারণ করলে হিতে বিপরীত ঘটনা ঘটে। তাই দুই মা বুদ্ধি করে ভিন্ন পন্থা নিলেন। মেয়ের মা একদিন ছেলেকে ডেকে পাঠালেন—তারপর নিজের উশৃঙ্খল মেয়ের সমন্ধে যা তা কথা বললেন। পক্ষান্তরে ছেলের মাও পিছিয়ে রইলেন না। তিনিও একদিন সেই মেয়েকে ডেকে আদর যত্ন করে খাইয়ে বললেন, 'তোমার মত একজন ভাল মেয়ে কী করে আমার বাউন্ডুলে ছেলেকে পছন্দ করলে আমি ভেবে পাইনা।' এই বলে তিনিও নিজের ছেলের সমন্ধে অনেক কল্পিত কেচ্ছা কাহিনী শুনিয়ে দিলেন। হাতে হাতে ফল মিলেছিল। দুজনে বিয়ের কথা ভুলে আবার পড়াশুনায় মন দিল।

অল রাউন্ডার

জগা আমাদের প্রতিবেশী। ওর মা বাড়ী বাড়ী ঝি-এর কাজ করেন। জগাকেও এক চায়ের দোকানে বয় হিসেবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। একদিন বন্ধুদের পরামর্শে ও বাড়ীতে টাকা দেওয়া বন্ধ করল। কারণ বন্ধুরা বলেছিল, 'বাড়ীতে টাকা দিয়ে ডাল ভাত খাবি কেন? হোটেলে মাংস ভাত খাবি।' এর পরে অন্য এক বন্ধুর পরামর্শে বম্বে পাড়ি দিল। কিন্তু বম্বে যাওয়া হয়নি। ট্রেনে বিনে টিকিটে যাচ্ছিল বলে মাঝপথে চেকার ধরল। উপরি পাওনা হিসেবে পিঠে পুলিশের লাঠি পড়ল। জগা আবার ওর মার কাছে ফিরে এল। এবারে এক সাইকেল সারাই এর দোকানে জগার ডাক

পড়ল। মালিক বললেন, ' হেল্পার হিসেবে কাজ করতে হবে, সপ্তাহে তিরিশ টাকা পাবি।' জগা রাজী হল না। জানাল, সপ্তাহে কুড়ি টাকা না পেলে সে কাজ করবে না।

আনাড়ী

ট্রেনে নিত্যযাত্রীরা অফিসে চলেছেন। কোথাও তিল ধারণে ঠাঁই নেই। এত ভীড়ে অনেকেই মেজাজ ঠিক রাখতে পারছেন না। দুই নিত্যযাত্রীর মধ্যে বচসা শুরু হল। একজন মাঝবয়সী ব্যাক্তি এক যুবককে তর্কে কোনঠাসা করে ফেলল। তর্কে অনভ্যস্ত যুবকটি প্রতিবাদ জানিয়ে বলল,'আপনি আমাকে আপনি বলে বলছেন কেন?' সঙ্গে সঙ্গে অন্য যাত্রীরা হৈ হৈ করে ঝগড়া থামিয়ে দিল। এমন আনাড়ীর সঙ্গে বচসা চলে না।

চেকিং

স্টেশনে টিকিট চেকিং হচ্ছে। এক মহিলা একটি অল্পবয়সী ছেলের মান্থলী নিয়ে এসেছেন বলে অভিযুক্ত হলেন। মহিলা বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালেন না। বললেন, 'এটা আমারই ছেলের মান্থলী। আমার ছেলের টিকিট নিয়ে পাড়াশুদ্ধ লোক কলকাতায় আসছে, আর আমি সেটি ব্যবহার করলেই দোষ।'

মামা ভাগ্নে সংবাদ

একটি ছাত্র ট্রেন ধরবে বলে ব্যারাকপুর স্টেশনে দাড়িয়ে আছে। কিন্তু ভীড়ে ট্রেনে উঠতে পারল না। অবশেষে গার্ডের শরণাপন্ন হল। গার্ড নিজের কামরায় উঠতে দিলেন কিন্তু ছেলেটি টিকিট কাটেনি বলে দশ টাকা চাইলেন। ছেলেটি বিনা প্রতিবাদে টাকা দিয়ে দিল। নির্দ্দিষ্ট স্টেশন আসতেই দেখা গেল স্পেশাল চেকিং। গার্ড বললেন, 'আমি চেকারদের বলে দিচ্ছি।' ছেলেটিকে নিজের ভাগ্নে বলে পরিচয় দিলেন। চেকাররা খুশীমনেই ছেলেটিকে যেতে দিল। ছেলেটি কয়েক পা গিয়েই আবার গার্ডকে বলল, 'মামা, শিগগির দশটা টাকা দাও, সঙ্গে টাকা আনতে ভুলে গেছি।' চেকারদের তাগাদায় গার্ড সেই দশ টাকার নোটটি আবার ছেলেটির হাতে তুলে দিলেন।

হারান প্রাপ্তি

সেবারে একটি নতুন ঘরে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পূজা, কীর্তন, বৈষ্ণব

সেবা এবং সবশেষে খিচুড়ীভোগ দিয়ে সকলকে আপ্যায়িত করা হল। সব মিটে গেলে দেখা গেল পাপুর একজোড়া নতুন হাওয়াই চটী উধাও। সেই জায়গায় একজোড়া পুরান চটী পড়ে আছে। আগেই সকলকে এ সম্ভাবনার কথা বলেছিলাম। যাই হোক পাপু খুব মনমরা হয়ে গেলে। পাপুকে বললাম, 'এই রকম আর একটি অনুষ্ঠান করলে নিশ্চয়ই কারো পায়ে করে সেই চটী ফিরে আসবে।'

কদিন পরে বাজার থেকে সবে বাড়ীতে পা দিয়েছি, দেখতে পেলাম রত্না ও পাপু দরজার সামনে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। ওদের চোখে মুখে দারুণ উত্তেজনা। ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি দরজার বাইরে সেই হারিয়ে যাওয়া সেই দুটি চটী। সেই চটী পায়ে দিয়ে এক বৈষ্ণব আমার মার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। বিনা বাক্যব্যায়ে সেই চটী পাল্টে রাখা হল। খানিক বাদে সে চলে গেল। আমার মা বললেন, 'বৈষ্ণবকেও সেই চটীর কথা বলেছিলাম।' সে বলেছে, 'আজকালকার মানুষ তো এই রকমই। সব ধান্ধায় থাকে। সুযোগ পেলে অন্যের চটী পায়ে দিয়ে চলে যায়।'

মওকা

আমার মেসোমশায় ছিলেন দারুণ মজার মানুষ। বরিশালে তাঁর একটি দোকান ছিল। দোকানের পাশ দিয়ে চাষীরা বাজারে আসত। দোকানের অদূরেই ছিল এই বাজার। একদিন এক চাষী লাউ নিয়ে বাজারে আসছিল, এমন সময় দোকানের ভেতর থেকে কিছু কথাবার্তা তাঁর কানে গেল। একজন বলছে, 'আগামীকাল লাউ পুজো কিন্তুবাজারে লাউ আসেনি। অতএব লাউ দেখতে পেলেই কিনে রাখতে হবে- তার জন্য যত টাকাই লাগুক।' একটু বাদে চাষী দোকানের সামনে আসতেই সকলে একসঙ্গে লাউ কেনার জন্য ঝাপিয়ে পড়ল। লাউওলা মওকা বুঝে পাঁচটাকা দাম হাঁকল। হাজার অনুরোধেও দাম কমাল না। অতঃপর সে লাউ নিয়ে বাজারে গিয়ে বসল। বলা বাহুল্য কোন ক্রেতা লাউ কিনতে এগিয়ে এল না। পাঁচ টাকা দিয়ে সেই আমলে কে লাউ কিনবে? দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেল। অগত্যা সে লাউ নিয়ে মেসোমশায়ের কাছে এল। চাব টাকায় দাম ঠিক হয়ে গেল। টাকা দিতে গিয়ে হঠাৎ তিনি বললেন, 'লাউয়ের গায়ে কেউ নখ বসায় নি তো?' একথা শুনে চাষীর মুখ কাঁচুমাচু হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, 'তুমি লাউ ফিরিয়ে নিয়ে যাও , কারণ এ লাউ পুজোয় লাগবে না।' চাষীর তখন একেবারেই অসহায় অবস্থা। শেষ পর্যন্ত একটা রফা হল। মেসোমশায় মাত্র দুই আনা দিয়ে লাউটি কিনলেন।

ক্ষুরধার বুদ্ধি

ফালানদা আমার মেসোমশায়ের সুযোগ্য পুত্র। কিশোর বয়সে আমরা একসঙ্গে অনেক আড্ডা মেরেছি। তাঁর চেহারা ছিল রাজপুত্রের মত এবং সেই সঙ্গে ছিল একমাথা ঘন কোঁকড়ান কালো চুল। সব চাইতেই বড় কথা তিনি ক্ষুরধার বুদ্ধি নিয়েই জন্মেছিলেন। একদিন তিনি চুল কাটাবেন বলে বাবার কাছে চার আনা পয়সা চাইলেন। বাবা পয়সা দিয়ে বললেন, 'চুল ছোট করে ছেট।' ফালানদা কম যান না। বললেন, 'আমার চুল কি ভাত মাছ খায়?' তাঁর বাবা বললেন, 'বেশ, তাহলে



বেণী বেধ।' ফালানদা আর তর্ক বাড়ালেন না। সোজা মাথা ন্যাড়া করে বাড়ী ফিরলেন। ছেলের কান্ড দেখে আমার মাসীমা বললেন, 'কী অলুক্ষুণে কান্ড, বাপ মা বেচে থাকতে ছেলে মাথা ন্যাড়া করে এসেছে।' তিনি ছেলেকে দু ঘা লাগিয়ে দিলেন। সেই থেকে ফালানদা নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। অবশ্য ফিরে এসেছিলেন মাস কয়েক পরে।

এর কিছুদিন আগে ফালানদা একবার ছোটভাই বাদলের উপর প্রচন্ড রেগে গিয়েছিলেন। বাদলও সেয়ানা কম নয়, সারাদিন বাড়ি ফিরল না এবং অনেক রাত অবধি দোকানে বসে রইল। এদিকে ফালানদা বাদলকে শায়েস্তা করবেন বলে উঠানে যাতায়াতের রাস্তায় একটি ক্ষুর পুঁতে রাখলেন। বাদল দোকান বন্ধ হয়ে গেলে বাড়ীতে ফিরল বটে তবে পেছনের বাগান দিয়ে। তারপর গাছ বেয়ে ঘরের চালে উঠে ডালপালার আড়ালে বসে রইল। রাত গভীর হতেই এক চোর দরজার সামনে এসে হাজির হল। চোর দেখে বাদলের তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম। সে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। এদিকে ফালানদা ঘুমোননি। দরজার সামনে এক লাঠি রেখে তিনি জেগে বসে ছিলেন। তিনি শব্দ পাওয়া মাত্র দরজা খুলে লাঠি হাতে

বের হলেন। এই রকম অভিজ্ঞতা চোরের জীবনে আর ঘটেনি। সে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। সকলে উঠে দেখতে পেল উঠানের মাঝখান থেকে এক রক্তের ধারা অনেক দূর অবধি চলে গিয়েছে। সেই মুহূর্তে ফালানদার সমস্ত রাগ জল হয়ে গেল। ছোট ভাই-এর সংগে গলায় গলায় ভাব হয়ে গেল।

দশচক্র

সুবোধ আমার মামাতো ভাই। আমারই সমবয়সী। কিশোর বয়সে দেশগাঁয়ে থাকতে একসঙ্গে বনে বাদাড়ে অনেক ঘুরেছি। চমৎকার ফুটবল খেলে, তাছাড়া নাটক ও কবিতা লিখে এবং অভিনয় করে বিস্তর সুনাম অর্জন করেছে এবং পুরস্কার ও পেয়েছে। কিন্তু ওর একটি মাত্রই দোষ—অতিমাত্রায় ভদ্র। তাছাড়া বেজায় ঘুমকাতুরে। যাই হোক এবারে মূল ঘটনায় চলে আসি। তখন আমরা মধ্য কলকাতায় এক কোয়ার্টারে থাকতাম। একবার ও বাড়ীর মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে সুদূর কুচবিহার থেকে এখানে এল। উদ্দেশ্য মহানগরী দর্শন। রাতে কথায় কথায় ও জানাল, 'আগামীকাল অফিসের ভীড় শুরু হবার আগেই বেরিয়ে পড়েছি। প্রথমেই যাব কালীঘাট। তারপর সেখান থেকে চিড়িয়াখানা চলে যাব। চিড়িয়াখানায় কয়েকটা ঘন্টা কাটিয়ে দুপুরে বাড়ী ফিরে আসব। বিকেলে আবার দক্ষিণেশ্বর দেখতে যাব।' আমি বললাম, 'তোর সদিচ্ছার জন্য সাধুবাদ জানাই। কিন্তু বাস্তব দিকটা বিবেচনা করে তিনটি দর্শনীয় স্থানের মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নিলেই বুদ্ধিমানের কাজ করতিস।' আমার কথা ও বিশ্বাস করল না। আমি বিশদভাবে বললাম, 'প্রথমতঃ অতো সকালে তোর ঘুম ভাঙবে না। দ্বিতীয়তঃ দেশগাঁ থেকে মহিলারা এসেছেন। তোর ঘড়ি ধরে তারা চলবেন না। তুই তাগাদাও দিতে পারবি না। তাগাদা দিলেও কোন লাভ হবে না। তৃতীয়তঃ এর সঙ্গে যোগ দেবে শহুরে জীবনের নানান অসুবিধে যেগুলো সমন্ধে তোর সঠিক কোন ধারণা নেই।' সুবোধ নিজের মত পাল্টাল না। বলল, 'সব ম্যানেজ করে নেব'। আমি বললাম, 'বাকীটুকু আগামীকালের জন্য মুলতুবী থাক।'

পরদিন কিন্তু খুব সকাল থেকেই বাড়ীতে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। সুবোধ ঘুমিয়েই রইল। বেলা সাতটা বাজলে ওকেও ডেকে তোলা হল। কিন্তু উঠলে কী হবে বাড়ীতে একটি মাত্র বাথরুম। এক এক করে বাথরুম সারতেই বেলা আটটা বাজল। তারপর সাজগোজের পালা। প্রথমেই ঠিক করা হয়েছিল আগে মা কালীকে দর্শন করে তারপরে চা খাওয়া হবে। কিন্তু ঠিক রওনা দেবার মুহূর্তে কেউ বললেন যে চা না খেলে তিনি চলতে পারবেন না। সঙ্গে সঙ্গে কেটলীতে জল বসান হল। অন্যেরা হাত লাগিয়ে কেউ আটা মাখলেন এবং আর একজন আলু কুটলেন।

সকলের প্রাতঃরাশ যখন শেষ হল তখন সকাল সাড়ে নটা। সবাই তৈরী এসময়ে কেউ বললেন, 'চানটা সেরে নিলে হত।' যুক্তি অকাট্য। এবারে এক এক করে স্নানের পর্ব এবং আগেই বলেছি একটিমাত্র বাথরুম। যখন সকলের স্নান শেষ হল তখন দুপুরের আহার তৈরী। বাড়াভাত ফেলে এতদূর রওনা হওয়া সমীচীন নয়। অতএব চলল আহার পর্ব। যখন আহার শেষ হল তখন ভর দুপুর। তখন সকলেই একবাক্যে রায় দিলেন ভরপেট খেয়ে তাদের পক্ষে ট্রামে বাসে ওঠা সম্ভব নয়। সামান্য বিশ্রামের প্রয়োজন। বিশ্রাম নিয়ে একটু বিকেল হতেই সকলে রওনা দিলেন। এবারে কালীঘাট বা চিড়িয়াখানা যাওয়া নিরর্থক—অতএব শুধু দক্ষিণেশ্বর। আমি বাসে তুলে দিতে গেলাম। হেঁটে যেতে যেতে একজন মন্তব্য করলেন, 'এত তাড়াহুড়ো করলে পারা যায়?' আমি সুবোধকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই কিছু বলবি?' ও ম্লান হাসি হাসল শুধু। সে হাসি ছিল সত্যিই দেখার মত।

ভাইপো

একবার এক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর আমার অধীনে ছিল। পরীক্ষায় নকল করা সংক্রান্ত রিপোর্ট নিয়ে কাজ হত বলে সেই বিভাগে বাইরের কাউকে যেতে দেওয়া হত না। অভিযুক্তরা সেই সব খবর জানার জন্য নানারকম ফন্দি ফিকির করত। একদিন দেরী করে অফিসে গিয়েছি। যেতেই সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছেলেটি এসে জানাল, 'খানিক আগে আপনার ভাইপো ফোন করেছিল, যা যা জানতে চেয়েছিল সব বলে দিয়েছি।' কথাটা শুনেই আমি হায় হায় করে উঠলাম। বললাম, 'আমার সেরকম পরীক্ষার্থী কোন ভাইপো নেই। আর আমি থাকতে ভাইপো খবর নিতে আসবে কেন?'

ইয়েস বস

একসময়ে আমি ও অসীম একই বিভাগে কাজ করতাম। তখন বয়সে সকলেই ছেলে ছোকরা। দিলীপবাবু নামে এক বয়স্ক ভদ্রলোক ছিলেন আমাদের সেকসান-ইন-চার্জ। তিনি নানা ছলছুতোয় অসীমকে বাগে আনার চেষ্টা করতেন, কিন্তু কখনই সফল হতেন না, কারণ অসীম ছিল বেজায় ধূর্ত। একদিন তিনি যখন ঘরে ছিলেন না, তখন অসীম আয়েস করে সিগারেট ধরাল। খানিক বাদেই তিনি ঘরে ঢুকলেন। অসীমকে বললেন, 'ঘরে ধোঁয়া কিসের?' ও অম্লানবদনে জানাল, 'আজ্ঞে, ঘরে ধূপকাঠি ধরিয়েছিলাম।' তিনি আর কোন জবাব দিতে পারলেন না। কয়েকদিন পরে তিনি এক বুদ্ধি আঁটলেন। পিয়নকে দিয়ে বাইরে থেকে একটি সিগারেট কিনে আনালেন। তারপর তিনি সেটি অসীমের হাতে দিয়ে বললেন, 'তোমাকে এখন থেকে

সিগারেট খেতে বাইরে যেতে হবে না, ঘরে বসেই সিগারেট খাবে।' অসীম প্রতিবাদ করল না, মুখ আড়াল করে লুকিয়ে সিগারেটটি খেল। কিন্তু তার পরই ওর মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি ভর করল। ও বাইরে আড্ডা দিয়ে আফিস ঘরে ঢোকার মুহূর্তে ঠোঁটে সিগারেট চেপে নিত। দিলীপবাবুর মুখখানা কালো হয়ে যেত। সহকর্মীদের কাছে তাঁর আত্মমর্যাদা ভীষণভাবে ক্ষুন্ন হল। ইঙ্গিতে অসীমকে ঐ অভ্যাস বন্ধ করতে বললেন। অসীম তাতে কান দিল না। বাধ্য হয়ে অসীমকে তিনি অনুরোধ করলেন। অসীম বলল, 'আপনি যা আদেশ করবেন তাই হবে।'

দূর্গাপুজো উপলক্ষ্যে আফিস বেশ কিছুদিন ছুটি থাকত। পূজোর পরে অফিসে যোগ দিয়ে সকলেই শুভেচ্ছা বিনিময় করে। দিলীপবাবু অসীমকে বললেন, 'তুমি আমাকে প্রণাম কর।' অসীম বলল, 'তা সম্ভব নয়, আমার যে ঠাকুমা মারা গিয়েছেন।' দিলীপবাবু হকচকিয়ে গেলেন। দুদিন পরে খেয়াল হল অসীম তাঁকে আবার ফাঁকি দিয়েছে। অসীমকে বললেন, 'তোমার ঠাকুমা মারা গেলে তোমার বাবা বিধিনিষেধ মানবেন, তোমার প্রণাম করতে তো কোন বাধা নেই।' অসীম জানাল,'আমাদের অন্য নিয়ম।' দিলীপবাবু এবারেও কোন কথা বলতে পারলেন না।

দাওয়াই

একবার অন্য এক বিভাগ থেকে কিছু তথ্যের প্রয়োজনে এক ভদ্রলোক আমাদের কাছে এসেছিলেন। সে তথ্য তিনি সময়মত পাননি। তাইতে সকলের উপস্থিতিতে তিনি অসীমকে দুচার কথা শুনিয়ে দেন। অসীম রাগে ফুসতে থাকে কারণ যিনি অভিযোগ আনসেন তিনিও কম ফাঁকিবাজ নন। কিন্তু কথায় বলে এক মাঘে শীত যায় না। একদিন খবর এল এক নির্জন ঘরে সেই ব্যক্তি দিবানিদ্রায় রত। সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিকল্পনা করে অসীম সেই ঘরে চলে গেল। এক পিয়ন ফাইল বগলে নিয়ে অন্যত্র যাচ্ছিল তাকেও সেই ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সেই সঙ্গে বলা হল, 'অসীম যাই বলুক তুই টু শব্দটি করবি না।' সেই ঘরে পিয়নটি ঢুকতেই অসীম ক্রোধে ফেটে পড়ল। বলল,'যাও নিজের ঘরে গিয়ে কাজ করোগে, অফিসটা কি ফাঁকিবাজী ও ঘুমোবার জায়গা? তোমাদের ঘাড় ধরে বের করে দিতে হয়....ইত্যাদি ইত্যাদি।' এর ফল কি হয়েছিল তা না বলে দিলেও চলবে। তবে পিয়নটি পরে সেকশানে জানতে এসেছিল, 'স্যার ব্যাপারটা কী?' পুরো ঘটনা শুনে তাঁর সে কী আফশোষ। বার বার বলতে লাগল, 'স্যার আমাকে আরও গাল পাড়লেন না কেন?

হেনস্তা

অসীম মোহনবাগান দলের গোড়া সমর্থক। একবার মোহনবাগান দল ইস্টবেঙ্গলের কাছে ফুটবল খেলায় হেরে গেল। মনের দুঃখে অসীম ঘরে দরজা দিয়ে আত্মগোপন করল। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হল না। ইস্টবেঙ্গল দলের সমর্থকেরা অসীমকে খুঁজে ঘর থেকে বের করল, তারপর জোরকরে সন্দেশ খাইয়ে বিজয়োল্লাস করতে করতে চলে গেল। অসীম এই অপমান দীর্ঘদিন অবধি ভুলতে পারেনি।

বজ্জাত ঘড়ির গল্প

আমাদের পরিচিত এক ব্যক্তি ছিলেন খ্যাতনামা একটি কলেজের অধ্যাপক। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের যে সমস্ত গুণ ও দোষ থাকা দরকার সব কয়টিই তাঁর ছিল। সব সময় গাদা গাদা বই ও ক্লাসনোটের মধ্যে ডুবে থাকতেন। খাটের পাশেই দেয়ালে এক দেয়াল ঘড়ি টাঙ্গান থাকত। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র লাভ হয়নি। কখন যে ক্লাসের সময় হয়ে যেত তিনি টেরও পেতেন না। কোনরকমে নাওয়া খাওয়া সেরে তিনি উর্দ্ধশ্বাসে ট্রেন ধরতে ছুটতেন। প্রতিদিনই এটা ঘটনা ঘটত। তিনি বাধ্য হয়ে ঘড়ির কাঁটা দশমিনিট এগিয়ে দিলেন। ভাবলেন কিছুটা সময় হাতে পাওয়া গেল। কিন্তু পরিস্থিতি বিন্দুমাত্র বদল হল না। তখন খুব বিরক্ত হয়ে ঘড়ির কাঁটা কুড়ি মিনিট এগিয়ে দিলেন। কোন অপরিচিত ব্যাক্তি এ বাড়িতে এলে ঘড়ির দিকে তাকালেই তাজ্জব বনে যেত। কিন্তু তিনি বিচলিত হলেন না। নোট লিখতে লিখতে আড়চোখে ঘড়ির দিকে নজর রাখতেন। কিন্তু তবু কিছু সুরাহা হয়নি। যখন সময় হত তখন নিজের মনে সময় নিয়ে কী প্লাস মাইনাস করতেন জানি না, তবে ট্রেন ধরার জন্য আগের মতই ছুটতে হত।

কিন্তু সব জিনিষেরই একটি শেষ অংশ। কিছুদিন হল তিনি চাকুরী জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন এবং ঘড়িটিকেও আর সময়ের আগে ছুটতে হয় না।

কথা রাখা

অমলের স্ত্রী একবার নার্সিং হোমে ভর্তি হলেন। একটি অপারেশন হবে। তখন ছেলে মেয়ে নিতান্তই ছোট। পাছে তারা আতঙ্কিত হয় তাই অপারেশনের কথা সরাসরি তাদের বলা হয়নি। অন্যদেরও সেকথা জানাতে বারণ করা হল। নির্দিষ্ট দিনে অপারেশন হয়ে গেল। সকলেই আভাসে ইঙ্গিতে রোগীনীর খবর নিলেন। অমলের বৃদ্ধা মাও বাদ গেলেন না। কিন্তু তিনি এত অল্পে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি একটু বাদেই ঘুরে এসে সকলের সামনে জিজ্ঞেস করলেন, 'রক্ত দিতে হয়েছিল?'

হবুচন্দ্র রাজা

এটি এক উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঘটনা। কিছুদিন আগে পি এইচ ডি বিভাগের সহকারী রেজিস্ট্রারের নামে একখানা চিঠি এল। সেই বিভাগের কোন সহকারী রেজিস্ট্রার ছিলেন না যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার আছেন। তবে তিনি পি এইচ ডি দপ্তরের কাজ দেখেন না। সেই কারণেই তিনি সেই চিঠির ভার নিতে রাজী হলেন না। তখন চিঠিখানা ডেপুটি রেজিস্ট্রারের কাছে দেওয়া হল। তিনি বললেন, 'আমার পক্ষে ঐ চিঠি খোলা সম্ভব নয় কারণ চিঠিখানি তো আমার কাছে লেখা হয়নি।' তবে তিনি সেই চিঠিখানি সহ উপাচার্য (শিক্ষা) এর কাছে পেশ করে সেটি খোলা হবে কিনা জানতে চাইলেন। সহ উপাচার্য (শিক্ষা) ছিলেন খুবই বিদগ্ধ ব্যক্তি। জীবনে কোন পরীক্ষাতেই দ্বিতীয় হননি। তিনি সেই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সুপারকে ডেকে পাঠালেন। তারপর জানতে চাইলেন চিঠিতে কী জানতে চেয়েছে। সুপার জানালেন চিঠিখানি না খুলে সে কথা বলা সম্ভব নয়। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, 'আগে সেটা জেনে নিন।' আগের চিঠির বক্তব্য জানতে চেয়ে পত্রপ্রেরকের কাছে চিঠি পাঠান হয়েছিল কিনা বলতে পারব না।

ওস্তাদের মার

আমার এক বন্ধু ছিলেন একজন অঞ্চল প্রধান। হাওড়ার এক শিল্পাঞ্চলে থাকতেন। সেই এলাকার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। ফলে তাঁর বিরোধীপক্ষ কিছুতেই তাঁকে ভোটে হারাতে পারত না। তবে তাঁকে জব্দ করার জন্য বহুভাবে চেষ্টা করত। সেই এলাকায় এক বিরাট কারখানা ছিল। বহিরাগত বহু শ্রমিক সেই কারখানায় কাজ করত। তাদের জন্য রেশনকার্ড প্রয়োজন। আমার বন্ধুটি বিস্তর ঘোরাঘুরি করে বেশ কিছু রেশনকার্ড করিয়ে আনালেন। ভাবলেন ধীরে সুস্থে সেগুলো বিলি করবেন। কিন্তু বিরোধী নেতা কী করে সেই খবরটি জানতে পারলেন। তারপর আমার বন্ধুটি আফিসে রওনা হতেই তিনি বিশাল মিছিল করে অঞ্চল প্রধান আফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন। খুব গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে হুশিয়ারী দিয়ে জানালেন যে অবিলম্বে রেশন কার্ড না পেলে তিনি আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। আমার বন্ধুটি আফিসে বসে সেই খবর ফোনে জানতে পারলেন। কিন্তু তখন তার পক্ষে করার আর কিছুই ছিল না। পরদিন শ্রমিকেরা যে যার রেশনকার্ড পেয়ে গেল। চতুর্দিকে বিরোধী নেতার জয় জয়কার পড়ে গেল।

বুদ্ধিমান

এক বুদ্ধিমান নিজের মেয়ে পাত্রস্থ করবেন। মেয়ে শিক্ষিতা ও সুন্দরী। একটি পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি আরেক বুদ্ধিমানের কাছে গেলেন। পাত্রের বাড়ীতে ফোনে যোগাযোগ করা হল। তারা জানতে চাইল পাত্রী শিক্ষিতা ও সুন্দরী কি না? তিনি বললেন, 'আজকাল চাইলেই কি শিক্ষিতা ও সুন্দরী পাত্রী মিলবে?' তারা এক কপি ফটো পাঠাবার কথা বললেন। তিনি বললেন, 'ফটো দেখে কি আর ভালমন্দ বোঝা যায়?' পাত্রপক্ষের কাছ থেকে আর কোন আগ্রহ দেখা গেল না।

•

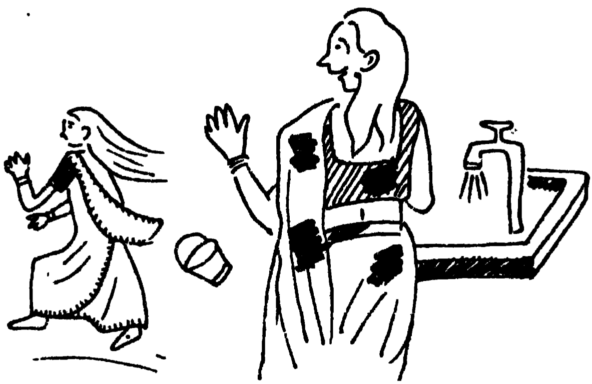
সদ্‌গতি

শেষ পর্য্যন্ত সরযূদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করলেন। দীর্ঘকাল থেকেই তিনি বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধাকে দেখে তাঁর অতীত দিনগুলোকে কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না। তিনি সেকালের মানুষ হয়েও সেকেলে ছিলেন না। ১৯৩৪ সালে ১৪৪ টাকার বিনিময়ে একটি সেলাই মেসিন কিনেছিলেন। সমস্ত ছেলেমেয়েদের সার্ট, প্যান্ট, ফ্রক এবং বড়দের সায়া ব্লাউজ কত যে সেলাই করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। স্বামী ডাক বিভাগে উচ্চপদে চাকরী করতেন এবং বদলীর চাকুরী বলে তাঁকে সেই সুবাদে বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হয়েছে। সেই সুযোগে তিনি বিভিন্ন ধরণের হাতের কাজ শিখেছিলেন। খোদ মণিপুরীদের কাছ থেকে খেস বোনা শিখেছিলেন। তাঁর হাতের কাজ বিভিন্ন প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হত এবং অনেক পুরস্কার লাভ করেছে। রং বেরং এর শিল্পকর্ম এত ছিল যে ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখার জায়গা হত না। দুপুরে আর সকল মহিলারা যখন দিবানিদ্রায় মগ্ন থাকতেন তখন তিনি বাঁশের ডালা, চালুনী, ডুলা ইত্যাদি তৈরী করতেন। তিনি উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সবচাইতে বড় সার্টিফিকেট তাঁর কৃতি সন্তানেরা-কেউ অধ্যাপক, কেউ ইনজিনীয়ার, কেউ অফিসার ইত্যাদি। নাতি নাতনীরা দেশ বিদেশে ছাড়িয়ে আছে। আর একটি অমূল্য সম্পদ বৃদ্ধার কাছে সযত্নে রক্ষিত ছিল। সেটি অর্ধশতাব্দীরও আগে তোলা একটি গ্রুপ ফটো। ফটোটি আসামের শিলচর শহরে তোলা। তখন তাঁর বয়স বড় জোর তিরিশ—কয়েকটি নাবালক পুত্র কন্যাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী গ্রুপ ফটোটি তুলেছেন। সগর্ব হাসিতে মুখ ভরে আছে। সেই পুত্র-কন্যারা এখন নাতি নাতনী নিয়ে ঘর সংসার করছেন। তবু সেই ছবিটিকে নিয়ে তাদের গর্বের অন্ত নেই, কারণ সেই ছবির মধ্যেই তারা তাদের অতীত দিনগুলোকে ফিরে পান। বৃদ্ধা মৃত্যুকালে তাঁর বড়ছেলের কাছে ছিলেন। তিনি গত হলে পুত্র কন্যারা সবাই একত্রিত হয়ে যথাসাধ্য পারলৌকিক কাজকর্ম সম্পন্ন করেন।

তবে তাদের আন্তরিকতায় হয়তো কিছু ত্রুটি ছিল। সেই অভাবটি পূরণ করলেন সেই বাড়ীর উচ্চশিক্ষিতা পুত্রবধূ। বৃদ্ধার বড় ছেলে সস্ত্রীক কয়েকদিনের জন্য বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি সেই বাধান ছবিটিকে টেনে নামালেন, তারপর ছবিটিকে বের করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলে দিলেন। তবে ফ্রেমটিকে নষ্ট করেন নি। সেই ফ্রেমে তিনি নুতন ছবি ভরে নিজের ঘরে টানিয়েছেন। বৃদ্ধার এতগুলো সন্তান বেচে থাকতেও একটি বিগত যুগের শেষ স্মৃতিচিহ্ন হারিয়ে গেল।

ফকিরের কেরামতি

মাণিকবাবু এবং তাঁর স্ত্রী শান্তা এমনিতে ভীষণ স্মার্ট কিন্তু দোল এলেই তারা অন্যরকম হয়ে যান। সকাল থেকেই ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে ভেতরে বসে থাকেন। সেবারেও তাই ঘটল। দুপুর অবধি দরজা জানালা বন্ধ রইল। ডাকাডাকি করেও কোন লাভ হল না। কিন্তু রান্নাবান্নার জন্য জল প্রয়োজন। টাইম কলে জল এসে গেল। শান্তা নিঃশব্দে দরজা খুলে একটা প্লাস্টিকের বালতি হাতে নিয়ে গুটি গুটি কলের দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু কিছুটা এগিয়েই দেখতে পেল ঘরের আড়ালে



আমার স্ত্রী রং-এ ভুত হয়ে তারই অপেক্ষায় দাড়িয়ে আছেন। শান্তা আর কিছু দেখার অবসর পেল না। এক ছুটে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিল। প্লাস্টিকের বালতি ও পায়ের হাওয়াই চটী বাইরে পড়ে রইল। আমার স্ত্রী বিজয়িনীর হাসি নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। তিনি পাশের বাড়ী থেকে একটি বাটি আনতে গিয়ে ছিলেন। শান্তার মুখোমুখি হওয়া নিতান্তই কাকতালীয়। তাছাড়া তিনি আদপেই রঙ খেলেন নি।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

এই বিরল প্রতিভার মানুষটিকে একবার খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি যে কত ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন তা বলে বোঝান সম্ভব নয়। খুব সম্ভব ১৯৬১ সালের ঘটনা। ঠিক এর আগেই আসামে বঙ্গাল খেদা আন্দোলনে হাজার হাজার বাঙ্গালী পরিবার নিরাশ্রয় হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। সেবারে প্রতিবারের মত ২৫শে বৈশাখ থেকে মার্কাস স্কোয়ারে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন সুরু হল। একদিন আলোচনাচক্রের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। সেবারে আলোচনার বিষয় ছিল—মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হওয়া উচিৎ। প্রস্তাবের স্বপক্ষে ছিলেন বিজ্ঞানী বসু, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। প্রস্তাবের বিপক্ষে ছিলেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত এবং আরও কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তি যাদের নাম এখন আর স্মরণ নেই। বক্তারা মঞ্চের চারদিকে ঘিরে বসেছিলেন তবে বিজ্ঞানী বসু ছিলেন মঞ্চের মাঝখানে এক তাকিয়া হেলান দিয়ে এবং আলোচনা চলাকালে দু একটি শুধু সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করছিলেন। কিন্তু সেটুকুই বিপক্ষের যুক্তিজাল ছিন্ন করার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। অধ্যাপক দত্ত আলোচনার সূত্রপাত করলেন। তবে পুরো আলোচনা শোনা হয়নি। যেটুকু শুনেছি তাই তুলে ধরলাম ঃ

দত্ত— ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। এখানে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির একত্র সমাবেশ। কারো সংগে কারো মিল নেই। এমন একটি ভাষা নেই যা গোটা ভারতবর্ষে চলে। এক্ষেত্রে ইংরেজীর গুরুত্ব অপরিসীম। একমাত্র ইংরেজীই পারে গোটা ভারতবর্ষকে এক করে ধরে রাখতে।

বসু— অসমিয়ারা যখন বাঙালীর বুকে ছুরি মেরেছিল তখন খোঁজ নিলে দেখা যাবে দুজনেই ইংরেজী জানে।

দত্ত— বাংলার বাইরে বাংলা ভাষা অচল। বাইরে গিয়ে চাকুরী খুঁজতে হলে ইংরেজী শিখতেই হবে। ইংরেজী না জানা থাকলে বাঙালী সর্বভারতীয় প্রতিযোগীতায় পিছিয়ে পড়বে।

বসু— ঘরকুনো বাঙালীকে মেরে না তাড়ালে কখনই ঘরের বাইরে যাবে না। যাদের প্রয়োজন তারা নিজেদের গরজেই যে কোন ভাষা শিখে নেবে। তার জন্য সকলকে ইংরেজী শেখাবার দরকার নেই। মারোয়াড়ীরা রাজস্থান থেকে এখানে এসে সুদূর পাড়াগাঁয়ে গিয়ে যে ব্যবসা করছে তারা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর অপেক্ষা করছে?

দত্ত— ইংরেজী বিজ্ঞান চর্চার ভাষা। ইংরেজী না জানলে বিজ্ঞানের বিষয় শিক্ষা সম্ভব নয়।

বসু— অম্লানের কথা সকলেই অম্লান বদনে মেনে নেবে বলে আমি মনে করি

না। আমি যখন আইনস্টাইনের সংগে কাজ করতাম তখন তিনি ইংরেজীতে আলোচনা করতে গেলে বিরক্ত হতেন। বলতেন, 'স্পীক ইন ফ্রেঞ্চ'। কারণ সবচাইতে উন্নত ভাষা ইংরেজী নয় ফরাসী ভাষা।

দত্ত— আজ বিজ্ঞানী বসুর যে পৃথিবীময় পরিচিতি তা ইংরেজীর জন্যই সম্ভব হয়েছে। ইংরেজীতেই তার গবেষণার কথা পৃথিবীর লোক জেনেছে।

বসু— মোটেও তা নয়। আমার মূল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এক জার্মান জার্নালে এবং তার জন্য আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হয়েছে বলে আমি মনে করিনা।

দত্ত— আমি সদ্য দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কিছু দেশ ঘুরে এলাম। জাপান যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে এত উন্নতি করতে পেরেছে তার মূলে রয়েছে ইংরেজী শিক্ষা। নিজের সাফল্য বিদেশে জানাতে গেলেও ইংরেজী ছাড়া গত্যন্তর নেই। উদাহরণ প্রসঙ্গে তাদের বৈজ্ঞানিক জার্নাল গুলির কথা ধরুন— সেগুলো ইংরেজীতেই প্রকাশিত হয়।

বসু— সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সেখানকার জার্নাল সেদেশের ভাষাতেই লেখা হয়। তবে প্রবন্ধের নীচে ইংরেজীতে সংক্ষিপ্তসার দেওয়া থাকে। যদি কেউ কোন প্রবন্ধের বিষয়ে জানতে আগ্রহী হন তবে তাদের লিখলেই মূল প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাংলা ভাষা

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। ছেলে থেকে বুড়ো অবধি অহরহ এই ভাষায় কথা বলি, কিন্তু এর জটিলতা আদৌ আমাদের নজরে পড়ে না। এবারে সেই কথাই বলি। অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এক আলোচনা চক্রে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছিলেন। একবার তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সস্ত্রীক রাশিয়াতে গিয়েছেন। থাকার ব্যবস্থা হয়েছে একটি হোটেলের ২৬ তলার একটি কক্ষে। সকালে তাদের নিয়ে যেতে গাইড এলেন। তিনি বাংলা শিখেছেন। হোটেলের রিসেপশন থেকে ফোন করে সুনীতিবাবুর ঘরে তার আসার কথা জানালেন। সুনীতিবাবুর স্ত্রী ফোন ধরেছিলেন। তিনি ফোনে বলে দিলেন, 'আপনি দাঁড়ান, আমরা আসছি।' কিন্তু অবাক কান্ড গাইড সে কথা বুঝতেই পারল না। তিনি সুনীতিবাবুকে সে কথা বলাতে তিনি বলতে বললেন, 'আপনি অপেক্ষা করুন, আমরা আসিতেছি।' এবারে গাইড ঠিক ঠিক কথাটা বুঝতে পারল।

কাছাকাছি

এক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের লোকজন খোঁজখবর নিতে আসে।

তারই নমুনা তুলে ধরছি। প্রথমে এক ব্যক্তি কাউন্সিলার কোথায় বসেন জানতে এলেন। তাকে কর্পোরেশন আফিসে যেতে বলা হল। তিনি জোর দিয়ে জানালেন তিনি বিত্র পরীক্ষার ব্যাপারে কাউন্সিলারের সংগে দেখা করতে চান। তাঁকে আন্ডার গ্রাজুয়েট কাউন্সিল আফিসে যেতে বলা হল।

অন্য এক দিন এক কুলী মাথায় অনেক বইপত্র নিয়ে এসে লেবার ইউনিয়নের আফিসে যেতে চাইল। তাকে বলা হল এখানে সেরকম কোন আফিস নেই। তারপর সে একটা চিরকুট দেখাল। দেখলাম তাতে লেখা আছে লাইব্রেরীয়ান।

কেউ টেলিফোনে একদিন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যাপারে যোগ্যতা কী তা জানতে চাইল। কে একজন বলে দিল গুরুতর অসুস্থ হলেই সেখানে ভর্তি হওয়া যাবে।

গণমাধ্যম

প্রতিদিন অহরহ কত ঘটনা ঘটছে। সংবাদপত্রে সে সব খবর প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাদেরও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। কারণেই একই খবর শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য কত বিচিত্র রূপ নিতে পারে তারই এক নমুনা তুলে ধরছি। বলা বাহুল্য এটা নিছক কল্পনা মাত্র। মূল ঘটনা জ্যোতি বসু হেটে হেটে গঙ্গা পার হলেন। সে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হবে তাই দেখুন ঃ

গণশক্তি— বুর্জোয়াদের সমস্ত অপপ্রচার ব্যর্থ করে জ্যোতি বসু গঙ্গা পার হলেন।

আজকাল— জ্যোতি বসুর সাফল্য অব্যাহত।

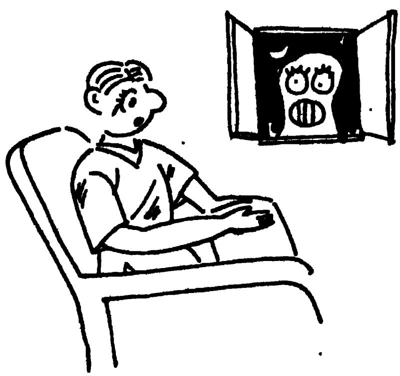
আনন্দবাজার— জ্যোতি বসুর আর এক চমক।

বর্তমান— জ্যোতি বসু এবারেও ব্যর্থ। সাতরে গঙ্গা পার হতে পারলেন না— হেটে গঙ্গা পার হলেন।

ছানা পোনার গল্প

ছানা পোনা বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝে থাকি এটা সেরকম কোন ঘটনা নয়। গল্প তো নয়ই। কথাটা নিতান্তই একটা স্ল্যাং। প্রতি বৎসর এক নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ইনজিনীয়ারীং কলেজে ভর্তির জন্য ছাত্র বাছাই করা হয়। তারপর কাউনসেলিং হয়ে নির্দ্দিষ্ট কলেজে গিয়ে ছাত্ররা যোগদান করে। এই সব ছাত্রদের বলা হয় ছানা। ছানাদের একটা দায়িত্ব থাকে—তাদের নিজ নিজ পোনা খুঁজে নিতে হয়। পোনা বলতে বোঝায় সেখানে পাঠরত কোন ছাত্র। অর্থাৎ দূর্গাপুরে

যারা ভর্তি হবে তারা সেখানকার পোনা খুজবে, অন্য কলেজগুলির বেলাতেও তাই। এটা বিশেষ জরুরী কারণ ছানাদের আর একটি অলিখিত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়-সোজা বাংলায় যার নাম র‍্যাগিং। কিছু কিছু বিধিনিষেধ সম্বন্ধে আগে থেকে ওয়াকিবহাল হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। যেমন গোঁফ রাখা চলবে না, ফুল স্লীভ সার্টের সব কটি বোতাম লাগিয়ে চলতে হবে, ঘড়ি বা বেল্ট ব্যবহারও নিষেধ। আবার অন্য কোথাও এক হস্টেলের ছাত্ররা অন্য হস্টেলের পাশ দিয়ে যেতে গেলে মাথার উপর হাত তুলে যেতে হয়। এই সব কারণেই পোনার সন্ধান খুবই জরুরী। বলতে পারেন বিপদে আপদে মধুসূদন দাদা। তবে সঠিকভাবে পোনা নির্বাচন অবশ্যই জরুরী। পোনা ভদ্র হলে ছানাও ভদ্র ব্যবহার পাবে, সে গান গাইতে জানলে ছানাদেরও গান গাইতে হবে, সে মাসলম্যান হলে ছানাদেরও শক্তির পরীক্ষা দিতে হবে আবার পোনার উপর অন্যদের আক্রোশ থাকলে অকারণেই ছানাদের গায়ে হাত পড়বে।



র‍্যাগিং সম্বন্ধে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন এবং কোথাও কম কোথাও বেশী এবং এ নিয়ে অনেকেই বিন্দুমাত্র ভয় পায় না। র‍্যাগিং মানেই যে গায়ে হাত পড়া তা কিন্তু আদপেই নয়। একটি ছানা তিনতলার একটি ঘরে থাকত। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে জানালার বাইরে ভূত দেখে সে ভিরমী খেল। পরদিনও সে ঠিক পেল না তিনতলায় বাইরে থেকে কী করে ভূত আসতে পারে? কিন্তু না, বুদ্ধি থাকলে সবই সম্ভব। ছাদ থেকে দড়ির সাহায্যে বাইরে থেকে নকল ভূত নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নবাগতদেয় সংগে পরিচয়পর্ব সুরু হয় হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে। মামুলী কিছু সহজ সরল প্রশ্ন। যেমন কলকাতার আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয় এবং একটি সুপারী গাছের মধ্যে মিল কোথায়? উত্তরটা আপনারও জানা আছে— উভয়েরই

কোন শাখা নেই। নিজের কোন জিনিস অপরে বেশী ব্যবহার করে? এর উত্তর চিরুণী। কিন্তু এই সব প্রশ্ন দেখে নিজেকে নিরাপদ ভাবার কোন কারণ নেই। আরামবাগ থেকে একটি রোগা পটকা ছাত্র ভর্তি হয়েছে। তাকে প্রশ্ন করা হল, 'কীরে তোর ওজন কত?' উত্তর দেওয়া মাত্র দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'পালক নিয়ে না পালক ছাড়া?' তবে বলে রাখা ভাল এই নূতন পরিচয়পত্র চট করে মন থেকে মুছে যায় না। কলকাতায় একটি নবাগত ছাত্র পুজোয় প্রতিমা দেখতে বেরিয়েছে। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ ডাকল, 'এই ছানা।' সংগে সংগে সে সার্টের হাতা খুলে বোতাম লাগিয়ে দাড়িয়ে পড়ল। যে সিনিয়র ছাত্রটি ডেকেছিল সে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেলনা।

এবারে প্রশ্ন উঠতে পারে যদি কেউ পোনা না জোটাতে পারেন তবে কী হবে? কিচ্ছু ভাবনা নেই। কিছু না কিছু প্রাক্তন বা স্থানীয় ছাত্র ঠিক জুটে যায়। এই তো সেবারে কলকাতার অদূরে একটি খ্যাতনামা কলেজে একটি নামী প্রতিষ্ঠান থেকে আসা একটি নবাগত ছাত্র কিঞ্চিৎ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। সেই প্রতিষ্ঠান থেকে আসা প্রাক্তন ছাত্ররা তাকে সংগে সংগে উদ্ধার করে এবং তাঁকে নিজের হস্টেল অবধি পৌঁছে দিয়ে আসে। কৃতজ্ঞতায় নবাগত ছাত্রটি অভিভূত হয়। সে চলে যেতে উদ্যত হলে উদ্ধারকর্তারা বলে, 'ও ভাবে নয় মাথার উপর হাত তুলে নাচতে নাচতে যাবি।' সব শেষে বলি ছানা পোনার সম্পর্ক কিন্তু খুবই গভীর। আমি যে একবিন্দু বাড়িয়ে বলছি না তার নিদর্শন নীচে দিলাম।

MENU OF THE DINNER

Our dear pona
Enjoy the grand khana-pina
It is Delicious
Experience it with mood
of joyous
Welcome to you all
To accept our hearty call
We'll have your remem-
brances with us
Goodbye with pots of love

First Year
Front Wing
11-04-99

1. Fried Rice
2. Chholar Dall
3. Fish Fry/Veg. Cutlet
4. Radha Ballavi
5. Alur Dam
6. Quarter Chicken Roast/ Motor Paneer
7. Chatni
8. Papad
9. Laddu
10. Mouchak
11. Cold Drinks
12. Pan Masalla
13. Chocolate/Cigarette

মনুষ্য চরিত্র

অমল বাড়ীতে নূতন কলের লাইন নিয়েছে। প্রতিবেশীরা সেখান থেকে খাবার জল সংগ্রহ করত। কিন্তু পাশের বাড়ীর এক ভাড়াটে মেয়ে সেই কলকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে ফেলল। সকলেই বিরক্ত হলেন কিন্তু কিছু বলার সাহস পেলেন না কারণ সেই বাড়ীর মহিলা ছিলেন খুব মুখরা। অবশেষে অমলের বৃদ্ধা মা এগিয়ে এলেন। মেয়েটিকে ভদ্রভাবে দু এক কথা বলতেই জল নেওয়া বন্ধ হল। দুদিন পরেই বৃদ্ধা মার খেয়াল হল ব্যাপারটা ঠিক হয়নি। তিনি গিয়ে সেই মহিলাকে বললেন, 'বৌমা তোমরা তো এখন আর জল নিতে আস না।' মহিলা বললেন, 'আপনিই তো বারণ করেছেন।' তিনি বললেন, 'তোমাদের বারণ করতে যাব কেন, আমার ছেলে বৌ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে।' এরপর অমলের বৌকে আড়াল থেকে যে কটুক্তি শুনতে হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

অমানুষ

একদিন অমলের বৃদ্ধা মা পাশের বাড়ীতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। তারা অনেক কষ্টে বৃদ্ধাকে শান্ত করলেন। বললেন, 'আপনার ছেলেমেয়েরা উপযুক্ত, সকলেই আপনাকে মান্য করে, খাওয়া পরারও ভাবনা নেই তবে আপনার আবার দুঃখ কী?' তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে জানালেন যে তাঁর অনেক সাধ ছিল ছেলে মেয়েরা একসংগে মিলে মিশে থাকবে কিন্তু তা আর হল না। তারা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন সংসারে আবার কী অশান্তি হল। বৃদ্ধা জানালেন সে সব কিছু নয় তবে অমল নূতন বাড়ী কিনেছে। বৃদ্ধা একবিন্দু মিথ্যা কথা বলেন নি। অমলেরা সব ভাই মিলে এক জায়গায় থাকত বটে তবে সেখানে জায়গার বড় অভাব ছিল। তাই অমল আফিস থেকে ধার করে কোনরকমে একটি আস্তানা কিনেছে।

সাধু সাবধান

প্রতিদিন বিকেলে টিটাগড়ে বি টি রোডের ধারে জমজমাট বাজার বসে। একদিন এক সাইকেল আরোহী কিছু কেনাকাটা করবেন বলে সাইকেল থেকে নামলেন। সাইকেলটিও নিজের সঙ্গে ছিল। সেটিকে পিঠের সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখে তিনি ঝুকে পড়ে কিছু কেনাকাটা করলেন। কেনাকাটা সেরে দাড়িয়ে দেখতে পেলেন পিঠের সংগে যেটি লেগে আছে সেটি একটি বাঁশের খুটি। আর সাইকেলটি বেমালুম অদৃশ্য।

*

দমদম রোডের দুধারেও জমজমাট বাজার বসে। একদিন এক ভদ্রলোক নিজের সাইকেল দাড় করিয়ে কিছু কেনাকাটা করবেন বলে কয়েক পা এগিয়েছেন, হঠাৎ পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলেন এক সাইকেল চোর তার সাইকেলে চড়ে চলে যাবার উদ্যোগ করছে। সংগে সংগে তিনি চেঁচিয়ে পথচারীদের বললেন, 'ধরুন, ধরুন।' রাস্তার পথচারীরা সেই সাইকেল আটকাতে গেল। চোরটি সাইকেলের হ্যান্ডেল কাঁপাতে কাঁপাতে বলল, 'ধরতে হবেনা শিখে গেছি।' তারপর এত লোকের চোখের সামনে সাইকেল নিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

* * *

এক যুবক রাস্তায় নিজের সাইকেল দাঁড় করিয়ে অদূরে এক গাছতলায় আড্ডা মারছিল। এক ছোকরা এসে তাঁকে সাবধান করে বলল, 'এ ভাবে সাইকেল রাখবেন না, চুরি হয়ে যেতে পারে।' যুবকটি তাচ্ছিল্যের সংগে সে কথা উড়িয়ে দিল। ছোকরাটি বলল, 'আজকাল লোকজনের চোখের সামনেই কত সাইকেল চুরি হয়ে যাচ্ছে। কীভাবে চুরি হয় বোধ হয় আপনাদের ধারণা নেই। ধরুন কেউ এসে আপনার সাইকেলের প্রশংসা করে সাইকেলে হাত দিল তারপর সোজা সেই সাইকেলে উঠে পড়ল।' সে আরও কিছু বলেছিল কিনা শোনা যায়নি কারণ তার আগেই সে সাইকেল নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

* * *

বিমল নামে একটি যুবক বেলগাছিয়া অঞ্চলে খুবই সুপরিচিত। একদিন সে বন্ধুদের সংগে পিকনিক করতে গেলে একটি যুবক তাঁর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। বিমল বাড়ীতে নেই শুনে জানাল যে সে একটি নূতন ভি সি পি ও ক্যাসেটের দোকান খুলেছে। একদিন বিমলদার বাড়ীতে ফ্রী ট্রায়াল দেবার কথা হয়েছিল। যদি বাড়ীর লোকজন রাজী থাকে তবে এখনই সে সেট নিয়ে আসতে পারে। বাড়ীর মহিলারা এককথায় রাজী! অতএব সেট এল এবং সিনেমা চলল। কিন্তু ঘন্টাখানেক পরে খানিকটা যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিল। তখন যুবকটি এক রিক্সা ডেকে সেটটি পাল্টাতে নিয়ে গেল। কিন্তু গেল তো গেলই। দর্শকরা অধৈর্য হয়ে পড়ল। কিন্তু সে আর এল না। পরদিন স্থানীয় এক ক্যাসেটের দোকান থেকে লোক এল। জানাল, 'গতকাল বিমলদার বাড়ী থেকে যে ভিসিপি ও ক্যাসেট ভাড়া করে আনা হয়েছিল তা এখনও ফেরৎ দেয়া হয়নি।' এই কথা শুনে বিমল তো মাথায় হাত দিয়ে বসল।

নিত্যযাত্রীর গল্প

একদিন লোকাল ট্রেনে শিয়ালদহ যাচ্ছি। বেলঘরিয়া ষ্টেশন থেকে এক অফিস

সহকর্মী উঠলেন। তাঁকে আমার পাশে বসতে বলতেই তিনি বললেন, 'সে উপায় নেই— আমাদের যে দাঁড়িয়ে যাবার টিকিট।'

* * *

একদিন এক অ্যাটাচী হাতে নিয়ে অমল ট্রেনে উঠল। ট্রেনে প্রচন্ড ভীড়। একটু ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেল কয়েকজন সীটে বসে থাকা যুবক হাতের ইশারায় তাঁকে ডাকছে। সে কাছে যেতেই তাদের মাঝখানে অমলকে বসার জায়গা করে দিল। তারপর অমলের অ্যাটাচী নিজেদের মাঝখানে রেখে তারা তাস খেলতে সুরু করে দিল। অমলের দিকে ফিরেও তাকাল না।

* * *

এক নিত্যযাত্রী শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামতেই দেখতে পেল সামনে চেকার দাড়িয়ে আছেন। সে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে হাঁটা দিল। চেকার পিছু ছাড়লেন না। তিনি জোরে ছুটতে শুরু করলেন-চেকারও তাই। শেষ পর্য্যন্ত তিনি ধরা পড়লেন। ধরা পড়তেই তিনি পকেট থেকে মাস্থলী টিকিট বের করে চেকারের হাতে দিলেন। চেকার অবাক হয়ে বললেন, 'টিকিট থাকতে আপনি ছুটছিলেন কেন?' তিনি বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন, 'আপনিই তো আমাকে তাড়া করলেন, তাই ছুটছিলাম।'

* * *

শিয়ালদহে মাঝে মাঝেই স্পেশাল চেকিং বসে। এক নিত্যযাত্রীর কাছে চেকার টিকিট চাইতেই তিনি বললেন, 'ডবলিউ টি।' চেকারটি খুশী মনে যাত্রীটিকে জরিমানা করে এক রসিদ কেটে দিলেন। লেখা শেষ হওয়া মাত্র যাত্রীটি পকেট থেকে নিজের মাস্থলী টিকিট বের করে চেকারের হাতে দিলেন। চেকার অবাক হয়ে বললেন, 'তাহলে ডাবলিউ টি বললেন কেন?' যাত্রীটি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দেখুন আমাকে ইংরেজী শেখাবেন না, আমি কি কখনও বলেছি, 'উইথ আউট টিকিট'? বলা বাহুল্য চেকারটিকে নিজের পকেট থেকেই জরিমানার টাকা গুণাগার দিতে হয়েছিল।

* * *

প্রতিটি রেল স্টেশনেরই একটি করে নাম থাকে। উপরি পাওনা হিসেবে নিত্যযাত্রীরা বিভিন্ন স্টেশনের কিছু কিছু নূতন উপাধি দেন। তারই কিছু নমুনা :

বিধাননগর — অলগ অলগ (দুটো প্লাটফর্ম অনেক তফাৎে)

দমদম — গঙ্গা যমুনা সরস্বতী (এই জংশন থেকে রেললাইন তিন দিকে ভাগ হয়েছে)

বেলঘরিয়া — মুঝসে ন ঠকরানা (এই স্টেশনে এত ভীড় যে ধস্তাধস্তি করে ট্রেনে উঠতে হয়, ফলে অচিরেই যাত্রীরা এক একটি কুস্তিগির হয়ে উঠেন)

সোদপুর — হম্ কিসীসে কম নেহী (এত যাত্রীসংখ্যা অন্য কোন স্টেশনে হয়না)

জগদ্দল — লাওয়ারিস (অধিকাংশ ট্রেন এখানে দাঁড়ায়না, কেউ দেখার নেই)

ভীতু

কুণাল ও তার ভাই রাতে পাশাপাশি এক খাটে শুয়ে আছে। দুজনেই যুবক-একজন চাকুরী এবং অন্যজন ঠিকাদারী করে। হঠাৎ রাতে ছাদে কিছু আওয়াজ শুনে দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল। শঙ্কিত হয়ে কুণাল তাঁর ভাইকে বলল, 'যা ক্লাবঘরে গিয়ে ছেলেদের খবর দে।' কিন্তু তাঁর সাহসে কুলোল না। ওদের মা পাশের ঘরে শুয়েছিলেন। তখন দু'ভাই পাশের ঘরে গিয়ে মার খাটে উঠে শুয়ে রইল।

লতায় পাতায়

মানিকবাবু আমার প্রতিবেশী। তার এক ভাই সপরিবারে কানাডাতে বসবাস করেন। সেখানে তাদের হোটেলের ব্যবসা। সেই ভাতৃবধূ যখন সন্তানসম্ভবা ছিলেন তখন হঠাৎ অ্যাবরশন হয়। মানিকবাবুর ভাই সে সুযোগ হাতছাড়া করেন নি। তিনি স্ত্রীর পরিচর্যার জন্য বাংলাদেশ থেকে নিজের মাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য সরকারের কাছে অনুমতি চাইলেন। সে আবেদন সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হল। সিলেট থেকে মানিকবাবুর বৃদ্ধা মাকে কানাডায় পাঠাবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। শেষে একদিন বৃদ্ধাকে জুতোমোজা পরিয়ে গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে কানাডাগামী বিমানে তুলে দেওয়া হল। তিনি এক বিন্দু ইংরেজী জানতেন না বলে একটি কাগজে প্রয়োজনীয় বাংলা ও ইংরেজী শব্দ পাশাপাশি লিখে দেওয়া হল। তিনি ঠিকমত সেখানে পৌছে গেলেন। তিনি তিন মাসের ভিসা পেয়েছিলেন। কানাডাতে গিয়েই তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলেন। কারণ হিসেবে জানালেন যে তিনি সক্রিয় রাজনীতি করেন বলে বাংলাদেশে তাঁর নিরাপত্তার অভাব। সেই আবেদনও মঞ্জুর হল। যতদিন না চাকুরী জোটে তিনি বেকারভাতা পাবেন এবং পরে দেখা যাবে চাকুরীর বয়স পার হয়ে গিয়েছে। অতএব চাকুরীও করতে পারবেন না। পরিবর্তে ওল্ড এজ পেনসন পাবেন। তিনি আবেদনে আরও জানিয়েছিলেন যে তাঁর এক পুত্র (অর্থাৎ মানিকবাবু) তাঁর নাবালক পুত্রকে বাংলাদেশে ঠাকুরমার জিম্মায় রেগে ইণ্ডিয়াতে চলে গিয়েছে এবং তিনিই নাতিকে দেখাশোনা করেন। অবশ্য বাস্তব ঘটনা অন্যরূপ এবং মানিকবাবুর ছেলে বাবার সঙ্গেই থাকে। যাই হোক ঠাকুরমার দৌলতে এই নাতি যে কোন সময়ে কানাডাতে যেতে পারবে। কিছুদিন পার হলে বৃদ্ধা আবার কানাডা সরকারের কাছে আবেদন করে জানাবেন যে তাঁর বৃদ্ধ স্বামী একাই বাংলাদেশে বসবাস করেন এবং তাকে দেখাশোনার কেউ নেই। তিনি বৃদ্ধ স্বামীকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইলে অনুমতি অবশ্যই মিলবে। বৃদ্ধ সেখানে গিয়ে আবার

জানাবেন যে বাংলাদেশে তাঁর আয়ের উপরে নির্ভরশীল দুই পুত্র আছে— তারা স্কুল কলেজে পড়াশুনা করে। অতএব তাদেরও সেখানে যাবার অনুমতি মিলবে। বাকী থাকবে শুধু সস্ত্রীক মানিকবাবু এবং তারা ভবিষ্যতে কী করবেন তা জানাননি।

বিধিলিপি

মুকুলদি আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। পাটনাতে তিনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা নিয়ে বসবাস করেন। স্বামী কয়েকবছর আগেই গত হয়েছেন। বড় ছেলে ডাকবিভাগে উচ্চপদে চাকুরী করে। সেই ছেলেই বোনেদের বিয়ে দিল। ছোটবোনের কয়েকমাস আগে বিয়ে হয়েছে। এবার তাঁর নিজের বিয়ে। কাকারাই সম্বন্ধ ঠিক করে দিয়েছেন। বিয়ে হয়ে যাবার পর আজ বৌভাত ও ফুলশয্যা। মুকুলদির আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই। আত্মীয় পরিজনে বাড়ী ভর্তি। সন্ধ্যার পরে এক এক করে নিমন্ত্রিতরা আসতে লাগলেন। বাড়ীর বাইরে প্যান্ডেল করা হয়েছে। মাঝরাত হবার আগেই খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হয়ে গেল। তারপর কয়েকজন যুবক প্যান্ডেলের নীচে টেবিল চেয়ার পেতে শুয়ে বা বসে জিনিষপত্র পাহারা দিতে লাগল। মাঝরাত পার হলে দেখা গেল বাসরঘর থেকে বরও সেখানে উপস্থিত। জানাল যে জিনিষপত্র সব ঠিকঠাক আছে কিনা তাই দেখতে এসেছে। তাকে বলা হল তা নিয়ে তাঁকে ভাবতে হবেনা। সে আবার বাসরঘরে চলে গেল। সম্ভবতঃ আরও একবার কি দুবার সে বাইরে এসেছিল তারপর পাহারায় রত যুবকেরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোর হলে দেখা গেল বর নিরুদ্দেশ। হাজার খুঁজেও তাঁর সন্ধান মিলল না। নূতন বৌকে বাপের বাড়ীর লোক এসে নিয়ে গেল। এ অবস্থায় একটি সম্ভাবনাই সকলের মনে জাগল। মুকুলদির এর আগে দু'একবার মাথায় গোলমাল হয়েছিল। ছেলেরও সেটা হওয়া সম্ভব। উপার্জনক্ষম পুত্রকে হারিয়ে মুকুলদি শোকে পাথর হয়ে গেলেন। নাওয়া-খাওয়ার ক্ষমতাও রইল না। কয়েকমাস পরে তিনি গত হলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে খবর এল তাঁর ছোটমেয়ে আত্মহত্যা করেছে। আত্মীয়স্বজনেরা পুলিসে খবর দিয়ে মৃতদেহ দাহ করতে দিলেন না। পোষ্ট মর্টেম করে জানা গেল যে সেই মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ খবর মেয়েটির পলাতক স্বামী ধরা পড়েছে এবং তার ৭ বৎসর কারাদণ্ড হয়েছে। এখন ক্ষীণ সন্দেহ জাগছে যে মুকুলদির ছেলের নিরুদ্দেশ হবার সঙ্গে তাঁর জামাতার কোন সম্বন্ধ থাকলেও থাকতে পারে। সে দহেজ নিয়ে বৌ এর উপর অত্যাচার করত বলে মুকুলদির ছেলে তাঁকে শাসিয়েছিল।

উপকার

পরের উপকার করতে অনেকেই ভালবাসেন। আমার বৃদ্ধা মা তার ব্যতিক্রম নন। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তবে তাঁর নিজস্ব কিছু বিশেষত্ব ছিল। তিনি কখনই চাইতেন না যে এ নিয়ে তাঁর নিজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হউক — সোজা কথায় বাড়ীর কেউ যেন মনে না করেন যে তিনি ঘরের জিনিষ পরকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। আমার বাড়ী থেকে বেশ খানিকটা দূরে এক বৃদ্ধা বসবাস করতেন। সেই বৃদ্ধার চাইতে যোগ্য দানের পাত্র আমার এলাকাতে আর কেউ ছিল না। কিন্তু সরাসরি সেই বৃদ্ধাকে কিছু দিতে আমার মা ইতস্ততঃ করতেন। তাই নিজের মনেই আগে থেকে একটু হোমওয়ার্ক করে নিয়ে আমার মা অগ্রসর হতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব তালগোল পাকিয়ে যেত। একটিমাত্র উদাহরণ তুলে ধরছি। একদিন সকালে বাজারে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি, এমন সময় মা একটি দু'টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই টাকার মধ্যে একটু আলু, এক ফালি কুমড়ো, কিছুটা ঝিঙা ও বেগুন নিয়ে আসবি।' আমি ভীষণ অবাক হয়ে (?) বললাম, 'আবাব সেই বৃদ্ধা দিয়েছেন তোমাকে বাজার করতে — তার বাড়ীর আশেপাশে কি লোকজন নেই?' মা বললেন, 'তাহলে কি আর তোকে বলি?' আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'এভাবে বাজার করা সম্ভব নয়, খুচরো পয়সা একেবারেই অমিল। তোমার দেবার ইচ্ছে থাকলে ঘর থেকে কিছু দিয়ে দিও। আর তাছাড়া তিনি তো নিজেই বাজার করতে পারেন।' মা বললেন, 'বুড়ো মানুষ রাতে যাবে বাজার করতে?' আমি বললাম, 'রাতে যাবার দরকার কী, দিনের বেলায় যাবে।' মা অবাক হয়ে বললেন, 'এই রোদের মধ্যে?'

গান

সঙ্গীতপ্রেমী না হলেও জীবনে অনেক গান শুনেছি। কিন্তু কুচবিহারের এক অখ্যাত গ্রামে একজন রাখাল বালক যে গান গেয়েছিলে তা আজও আমার কানে লেগে আছে। গানটি মাত্র দু'লাইনের, সুর নিয়েও ঝামেলা নেই, নিজের ইচ্ছেমত একটা সুর দিয়ে নিলেই চলবে ঃ

এত্তি কোণা রোজ আসে দুরা মারারা।
দুরা মারি ভাত খায় দুস শালারা।

(দুরা মানে যে কচ্ছপ তা আশা করি না বলে দিলেও চলবে।)

নজরদারী

পশ্চিমবঙ্গের এক অর্থনৈতিক অনগ্রসর এলাকাতে একটি কলেজ আছে। এককালে সেই কলেজের অধীনে ৪টি ছেলেদের এবং ২টি মেয়েদের হস্টেলে ৬০০ ছাত্রছাত্রী বসবাস করে সে কলেজে পড়াশুনা করত। সরকারী অনুদানে এই সব আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের থাকা খাওয়ার খরচ চলত। একজন সুপার এবং একজন লেডী সুপারের কড়া নজরদারীতে এই সব ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা করত। ছাত্র-ছাত্রীদের হস্টেলগুলো কাছাকাছি বলে কড়া নজরদারীর প্রয়োজন ছিল এবং কলেজ অধ্যক্ষ সেই রকমই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা সত্বেও কিছুদিন পরে অধ্যক্ষ খবর পেলেন যে রাতের অন্ধকারে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা আবাসিক গোপনে সাক্ষাৎ করে। অধ্যক্ষ খুবই বিরক্ত হয়ে কয়েকজন ছাত্রকে গোপনে নজর রাখতে বললেন। অচিরেই অপরাধীরা ধরা পড়ল। দেখা গেল দুই অপরাধী আর কেউ নন — সুপার এবং লেডী সুপার। মুহূর্তে এই মুখরোচক সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং দেখতে দেখতে শিক্ষামন্ত্রী অবধি এ খবর জানতে পারলেন। যেহেতু সরকারী অনুদানে এই ছাত্রাবাসগুলির খরচ চলত এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা এখানে থেকে পড়াশুনা করত সেইজন্য সকলেই বিব্রত বোধ করলেন। কারণ এ নিয়ে বিধানসভায় প্রশ্ন উঠতে পার। কলেজ অধ্যক্ষ রাইটার্স বিল্ডিং-এ গেলে শিক্ষা অধিকর্তা তাঁকে দুটো অপ্রিয় কথা শুনিয়ে দিলেন। কলেজে ফিরে এসে অধ্যক্ষ অপরাধীদের ডেকে পাঠালেন এবং পরিস্কার জানিয়ে দিলেন যে অবিলম্বে তারা দুজন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হলে তিনি কড়া ব্যবস্থা নেবেন। তিনি যে একবিন্দু বাড়িয়ে বলেননি দু'দিন পরেই তা বোঝা গেল। তিনি অপরাধীদের মাহিনা বৃদ্ধি বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন দু'দিন পরে চাকুরীও থাকবে না। এর পরে অপরাধীদের পিছিয়ে যাবার আর কোন পথ খোলা রইল না। এবারে ছাত্রছাত্রীরা এগিয়ে এল। তারাই উদ্যোগী হয়ে সুপার ও লেডী সুপারের বিয়ে দিয়ে দিল। আয়োজনের বিন্দুমাত্র কমতি ছিল না। এর মধ্যে বেশ কয়েক বছর গত হয়েছে। এখন তারা দুজনে পুত্র কন্যা নিয়ে সুখে ঘর সংসার করছে।

উনিশ বিশ

চাঁদ নূতন কোচিং সেন্টার খুলেছে। জনা দশেক ছেলে মেয়ে ভর্তি হয়েছে। অধিকাংশই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে একদিন ফল প্রকাশিত-হল। একজন প্রতিবেশী চাঁদকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ছাত্রদের খবর কী?' ও

জবাব দিল, 'যাকে নিয়ে ভাবনা ছিল সে পাশ করে গিয়েছে।' পরে খবর নিয়ে জানা গেল ঐ একজনই শুধু পাশ করেছে বাকী সব ফেল।

* * *

উত্তরবঙ্গে অমলের শ্বশুড়বাড়ী। দেখতে দেখতে শ্যালকেরা বড় হয়ে উঠল। বর্তমানে দুই জন বিবাহযোগ্য। কিন্তু বড়জনের আয় অপেক্ষাকৃত কম বলে বাবা মা ততটা গরজ দেখালেন না। কিন্তু পরের জন চুপ করে বসে রইল না। সে হৈ চৈ বাঁধিয়ে ফেলল। সবাইকে বলতে লাগল, 'বাবা মা দাদার বিয়ে দিচ্ছে না।' আত্মীয়স্বজনরা উদ্বিগ্ন হয়ে পাত্রীর সন্ধান করতে লাগলেন। অচিরেই সন্ধান মিলল। তারপর ছোটটির আগে বিয়ে দিতেই আর কোন সমস্যা রইল না।

* * *

আজকালকার মেয়েরা পোষাকে আশাকে, চালে চলনে ও কথাবার্তায় অনেক বেশী ফরোয়ার্ড। এক বিশ্ববিদ্যালয়ে লিফটের সামনে কয়েকজন ছাত্রী অপেক্ষা করছে। এমন সময় আরও কয়েকজন ছাত্রী সেখানে এল। অপেক্ষারত একজন ছাত্রী তাঁর এক বান্ধবীকে দেখতে পেয়ে বলল, 'কীরে শালা কেমন আছিস?' এ সময় একজন যুবক পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কথাটা কানে যেতেই যে বলল, 'ম্যাডাম ভুল বললেন, শালা নয় শালী বলুন।'

অবাক কাণ্ড

একজন বোকা লোক প্রথম দেশগাঁয়ে এসেছে। সে দেখতে পেল একটি ফলন্ত সুপারী গাছকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে একটি পান গাছ বড় হয়েছে। শুধু তাই নয় সে আরও দেখতে পেল যে পানগাছের গায়ে চুণও (আসলে কাকের বিষ্ঠা) লেগে আছে। সে একেবারে তাজ্জব বনে গিয়ে এইভাবে নিজের অভিজ্ঞতা জানাল —

একই গাছে পানসুপারী, একই গাছে চুণ
কিবা দেশে আইলাম রে ভাই, কিবা দেশের গুণ।

মুড

অমলের এক ভাই এর জন্য পাত্রী সন্ধান করা হচ্ছিল। এক জায়গায় পাত্রী পছন্দ হল। কিন্তু সামনে দুর্গাপূজো এবং তার পরেই কার্তিক মাস। কারণেই এই সময়ে কোন কথাবার্তা বলা চলেনা। মার্চ মাস পড়তেই পাত্রীর দাদা কথা বলতে এলেন। যেদিন এলেন ঠিক তার আগের দিন পাশের বাড়ীতে এক আত্মীয়

পরলোকগমন করলেন। অমলের দাদা বললেন, 'এভাবে এলে হয়! দেখছেন তো পাশের বাড়ীতে এক মিসহ্যাপ হয়ে গিয়েছে। আমি কথা বলব সে সময় নেই। কলকাতায় আমার ভাই এর সঙ্গে কথা বলে এলেই হোত?' হতাশ হয়ে পাত্রীর দাদা চলে গেলেন। এর পরে যথারীতি খবর দিয়ে পাত্রীর বাবা দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। অমলের দাদা বললেন, 'এভাবে আপনার আসার দরকার কী? ছেলেদের পাঠিয়ে দিলেই হত।' তিনি বললেন, 'তা হলে কথাবার্তা কী করে হবে?' অমলের দাদা বললেন, 'খবর দিলে আমিই আপনার বাড়ী চলে যেতাম। পাকা কথা সেখানেই হোত।' যাই হোক সেদিনই পাকা দেখার দিন ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু নির্ধারিত দিনে অমলের দাদা গেলেন না। বললেন, 'আমার সময় নেই।'

কথা রাখা

অমল আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে বেহালাতে পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করতে গেল। গাইড হিসেবে গেলেন নুপুরের বাবা। তিনি অমলের ছোট ভগ্নীপতি। তিনি আবার একটু লাজুক প্রকৃতির। সকলেই আশীর্বাদ করে পাত্রীর মুখে মিষ্টি তুলে দিলেন। কিন্তু একটি ক্ষেত্রেই কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটল। ভাবী জামাইবাবু হবার সুবাদে পাত্রী কয়েকবার অমলের ভগ্নীপতির মুখে মিষ্টি তুলে দিল। আশীর্বাদ শেষ হলে জলযোগপর্ব শুরু হল। খানিকবাদেই আবার মধ্যাহ্নভোজনের ডাক পড়ল। সেখানেও ইলিশ মাছ, মাংস, দৈ-মিষ্টি সহ বিশাল আয়োজন। ভগ্নীপতিকে অস্বস্তিতে পড়তে দেখে অমল কপট বিরক্তির স্বরে বলল, 'আপনি কিন্তু কথা রাখলেন না। আসার আগে বলেছিলেন এটা খাব, ওটা খাব আর এখন শুধু না না করে যাচ্ছেন।'

বিদ্যার্থী সমাচার

কলকাতার বনহুগলীতে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। সেখানে অর্থোপেডিক সংক্রান্ত কয়েকটি কোর্স পড়ান হয়। একবার সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক পরিদর্শক দল এসেছেন। সেখানকার একজন অধ্যাপক পরিদর্শক দলের লোকজনদের ক্যাম্পাসে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাদের আউটডোর ক্লিনিক, জলের পুল, ফিজিওথেরাপির সরঞ্জাম, লাইব্রেরী ইত্যাদি দেখিয়ে অবশেষে ওয়ার্কশপে নিয়ে এলেন। সেখানে বাংলাদেশ থেকে জনা ত্রিশেক ছাত্র হাতে কলমে কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরী করা শিখছিল। তাদের একজনকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কইত্থান আইছ?' পরিদর্শক দলের একজন সদস্য বললেন,' এখানকার ভাষা বললেই

সকলে বুঝতে পারবে।' তিনি বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে জবাব দিলেন,'ওতে আরও ভাল বুঝবে।'

*   *   *

এক ইঞ্জিয়ারিং কলেজে নবাগত ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপক মহাশয় প্রথম পরিচিত হচ্ছেন। ক্লাসের ছাত্রদের সকলকে নিজ নিজ নাম এবং কোথায় বাড়ী বলতে বললেন। মণিপুর থেকে আগত একটি ছাত্র নিজের পরিচয় দিলে তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে একটি সাধারণ বাংলা কথা লিখে তিনি তাঁকে তা পড়তে বললেন। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে তা পড়ে দিল। কিন্তু কথাটির অর্থ কী জিজ্ঞেস করলে সে কিছুই বলতে পারল না। তখন অধ্যাপক মশায় এর কারণ ব্যাখা করে বললেন, 'ওরা বাংলা হরফ ব্যবহার করে বলে বাংলা পড়তে পারে কিন্তু একবিন্দু বাংলা জানে না।'

*   *   *

১৯৬২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের পঞ্চম বর্ষের কিছু উৎসাহী ছাত্র হাতে লিখে একটি দেয়াল পত্রিকা বের করেছিল। তারই এক সংখ্যা থেকে অংশবিশেষ তুলে ধরছি—'একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, শোভনা ও শ্যামলী এই মরকতকুঞ্জে আমরা সবাই-ই হয়তো নিরালা কোন ছায়াঘন কুঞ্জবীথির কৃষ্ণা যবনিকার আড়ালে বিমল আনন্দে পূরবী রাগিনীতে সুর তুলিনি, মঞ্জুল স-মী-র (আ) স্পর্শে বিহ্বল হয়ে সবাই-ই হয়তো গায়ত্রী মন্ত্রে অমিতা সুন্দরী হৃদয় নন্দিনী পারিজাত মালায় শোভিতা কুমকুমে রঞ্জিতা যোগমায়া কোন দেবযানীকে স্বাগত জানাই নি কিন্তু তবু কেউ হয়তো করেছে...।' আপাতদৃষ্টিতে এই লেখাটুকু অর্থহীন মনে হলে এর মধ্যে ক্লাসের সব কয়জন ছাত্রীর নাম উল্লেখ আছে। যতদূর মনে পড়ে সে সময়ে মোট ১০৬ জন ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে ১৪জন ছাত্রী ছিল।

*   *   *

পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেবার জন্য কিছু কিছু পরীক্ষার্থী দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। তারই একটি নমুনা তুলে ধরছি। ১৯৬২ সালে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামকের কাছে নিম্নোক্ত চিঠিখানি এসেছিল :

আমি বি.এইচ. এম. এস. পরীক্ষা দিয়েছি। পাস করিয়ে দিতে হবে। যা চাইবেন তাই দেব। আমার বয়স ২৪। যদি টাকা চান তাও দিতে পারি। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। পাস না করলে বিয়ে করতে পারছি না।

(এই চিঠির সঙ্গে রেজিস্ট্রি বিয়ের সার্টিফিকেটের কপি দেওয়া হয়েছিল)

*   *   *

এখানকার একজন ছাত্র ইঞ্জিয়ারিং কলেজে ভর্তি হবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

নির্দিষ্ট কলেজে যাবার আগে সেখানে পরিচিত কাউকে পাওয়া যায় কিনা খোঁজখবর নিতে সুরু করল। যাতে কোনরকম র‍্যাগিং না হয় তাই এইরকম সতর্কতা। কলেজের অধ্যাপক মশায় সেখানে পাঠরত একজন পরিচিত ছাত্রের নাম বললেন। স্থানীয় ছাত্রটি কয়েকমাস পরে ফিরে এলে অধ্যাপক মশায় তাঁর রেফারেন্সে কাজ হয়েছিল কিনা জিজ্ঞেস করলেন। ছাত্রটি বলল, 'স্যার ওকি আমায় কম জ্বালাতন করেছে?'

*　　　*　　　*

সেবারে আমাদের এক আত্মীয়কন্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট ওয়ান অনার্স পরীক্ষা দিচ্ছিল। পরীক্ষা দিতে দিতেই তার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যায়। তখনও প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা বাকী। অবশ্য তা নিয়ে ভাবনা ছিল না। কারণ বেশ কয়েকদিন ধরে সেই পরীক্ষা চলে এবং বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে পরীক্ষা নেওয়া হয়। অধ্যক্ষকে অনুরোধ করে গ্রুপ পরিবর্তন করা কোন সমস্যাই নয়। পরীক্ষার প্রোগ্রাম প্রকাশিত হলে দেখা গেল যে যে তিনদিন তাঁর প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা তার মাঝের দিনটিতেই তাঁর বিবাহ। আত্মীয়টিকে সঙ্গে সঙ্গে কলেজ অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হল।

বিয়ের আগের দিন থেকে বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন আসতে লাগলেন। কিন্তু দেখা গেল বিয়ের কনে বাড়ী নেই। শুনলাম তাঁর পরীক্ষা। সালোয়ার কামীজ পরে সে প্রতিদিন কলেজে যেত। সেই পোষাকেই সে পরীক্ষা দিতে গেল। পরের দিন অর্থাৎ বিয়ের দিনও তার ব্যাতিক্রম হল না। কিন্তু বাসী বিয়ের দিন তাকে নববধূর বেশে পরীক্ষাকেন্দ্রে হাজির হতে দেখে সকলেই হকচকিয়ে গেল। ক্লাসের বন্ধুরা ভাবতেই পারেনি যে রাতারাতি এমন পরিবর্তন ঘটবে। বাড়ীতেও এ নিয়ে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সকলেই প্রশ্ন তুললেন কলেজ অধ্যক্ষকে এ নিয়ে অনুরোধ করা হয়নি কেন? অবশ্য আমার আত্মীয়টি কিছুই করেননি বলা ঠিক হবে না। তিনি নিজে কলেজে যাননি বটে, তবে ক্লাসের একটি মেয়েকে দিয়ে অধ্যক্ষকে অনুরোধ করেছিলেন। অধ্যক্ষ সে আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি মেয়েটির সেই পরীক্ষার দিন পিছিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আত্মীয়কন্যাকে বিয়ের দিনগুলিতেই পরীক্ষায় সামিল হতে হয়েছিল।

পরিমাপ

জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার অনেককেই করে নিতে হয়। তা আর্থিক বা পরিমাপ দু দিক থেকেই হতে পারে। বিনয়ের সঙ্গে শিলিগুড়িতে এক ভদ্রলোকের আলাপ হয়েছিল। তিনি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এবং নিজের প্রচেষ্টায়

জীবনে অনেক উন্নতি করেছেন। তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন যে তাঁর বেয়াই মশাই ও তাঁকে ঠকিয়েছেন। বিনয় ভাবল নিশ্চয়ই দেনা পাওনা সংক্রান্ত কিছু গন্ডগোল। ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করল, 'কতটা ঠকিয়েছে?' তিনি জানালেন, 'দুই ইঞ্চি'। এরকম জবাব শুনে বিনয় হকচকিয়ে গেল। বিস্মিত বিনয়কে তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'দেনাপাওনার কোন ব্যপার ছিল না। তবে বিয়ের আগে আমার বেয়াইমশাই বলেছিলেন যে তাঁর মেয়ের উচ্চতা পাঁচফুট চার ইঞ্চি কিন্তু আমি জানি আমাদের বৌমার উচ্চতা পাঁচফুট দুই ইঞ্চির বেশী নয়।' ও জিজ্ঞেস করল, 'কী করে বুঝলেন—উচ্চতা মাপতে গিয়েছিলেন নাকি?' তিনি বললেন, 'আমি একজন ফার্স্টক্লাস এঞ্জিনিয়ার—আমরা এক নজর তাকিয়েই উচ্চতা বলে দিতে পারি। তবে আমাদের বৌমা সত্যিই ভাল। তার সমন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই।'

মওকা

আমাদের পাড়ায় এক বাড়ীতে একজন কাঠের মিস্ত্রি ভাড়া এসেছেন। পুরান কাঠ পাইকারী দরে কিনে সুন্দর সুন্দর ফার্ণিচার তৈরী করেন। এক পরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, 'খুব সস্তায় ফার্ণিচার বানিয়ে দেব।' তিনি একবিন্দু মিথ্যা কথা বলেন নি, কারণ ফার্ণিচার রাখার মত তার কোন শোরুম বা ঘর ছিল না। মওকা বুঝে ডাইনিং টেবিল, চেয়ার, দরজা ইত্যাদি অনেক কিছু বানিয়ে নিলাম। ভাবলাম খুব দাঁও মেরেছি। কিন্তু সেটাই আমার কাল হল। তিনি আমার বাড়ীটাকে শোরুম বানিয়ে যখন তখন খদ্দের নিয়ে আসতে শুরু করলেন।

লঘুগুরু

অনন্তদা আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। একবার এক বিয়ে উপলক্ষ্যে আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। দেখা গেল তিনি একটি ঘরের বাইরে পায়চারী করে যাচ্ছেন আর ঘরে ঢুকবেন কিনা ভাবছেন। কিন্তু সেই ঘরে ঢোকার মত অবস্থা নেই কারণ মহিলারা সেই ঘর দখল নিয়েছেন। শেষে নিজের ভাইঝিকে দেখতে পেয়ে হাঁক দিলেন, 'শেবু, বারুদের কৌটা।' শেবু ওরফে শেফালী ঘর থেকে একটি নস্যির কৌটা এনে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ও কথা বললি কেন?' অনন্তদা ইশারায় একজন বয়স্ক ব্যাক্তিকে দেখিয়ে বললেন, 'দেখছিস না পিসেমশায়।'

বাহাদুরের বাহাদুরী

সুদীর্ঘকাল চাকুরী করে কৃষ্ণ বাহাদুর থাপা সম্প্রতি চাকুরীজীবন থেকে অবসর নিল। যখন প্রথম চাকুরীতে ঢুকেছিল তখন ওর খুবই কম বয়স ছিল। পরবর্তীকালে যখন ওর বয়স রেকর্ড করায় তখন বয়স এত কমিয়ে লেখে যে এখন ও আর ওর চাকুরীরত ছেলে প্রায় সমবয়সী। ওর চাকুরী স্থায়ী হবার ব্যাপারটাও খুব মজার। প্রথমে বদলীতে নিয়োগ পেয়েছিল। তারপর একদিন ওকে বলা হল, 'কাল থেকে আর আসতে হবে না।' তখন ও কোথা থেকে একটা নেপালী কুকরী জোগাড় করে সোজা আফিসারের ঘরে ঢুকে যায়। তারপর সেই অস্ত্রটি নিজের গলায় ঠেকিয়ে বলে, 'নোকরী গেলে এখানেই খুদখুশী করব।' আফিসার ঘাবড়ে গিয়ে ওকে আবার



চাকুরীতে বহাল করেন। তখন ওর হাত থেকে অস্ত্রটি নিয়ে সকলে দেখতে পেল যে ওতে বিন্দুমাত্র ধার নেই। ও এইভাবে সকলকে বোকা বানিয়ে চাকুরী বাগাল বলে সকলেই ওর উপর বিরক্ত হয়েছিল।

আমার মত

একবার প্রমোশন পেয়ে আমি অফিসের মেইন বিল্ডিংএ চলে যাই। কিছুদিন পরে আমার আগের বিল্ডিং থেকে এক নেপালী মহিলা পিয়ন চিঠি লাগাতে সেখানে এল। আমাকে সেখানে দেখতে পেয়ে সে ভীষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি আমাদের ওখানে ছিলেন না? আমি গম্ভীর ভাবে বলি, 'তুমি কি আমাকে সেখানে

দেখেছ?' আমার এভাবে উত্তর দেওয়া শুনে ওর বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যায়। ও থতমত খেয়ে বলে, 'না না আপনারই মত।'

ভদ্রভাবে

একটি পিরিয়ড অফ থাকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক স্নাতোকোত্তর বিভাগের কিছু ছাত্রছাত্রী একটি ক্লাসঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। খানিক বাদে একজন ছাত্র এসে খুব মাতব্বরী সুরু করে দিল। দূর থেকে আর একজন সহপাঠী রাহুলকে ডাকল। রাহুল সাড়া দিলে দূরদর্শনে বিজ্ঞাপনের কায়দায় বলল, 'রাহুল পানি চলা যায়েগা'। ঋদ্ধি বিরক্ত হয়ে বলল, 'এবারে ফোট'। সমস্বরে সকলে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'ভদ্রভাবে কথা বল।' ঋদ্ধি নিজের ত্রুটি স্বীকার করে পুনরায় বলল, 'এবারে ফুটুন।'

হানিমুন

আমাদের এলাকাতে সারদা পাঠচক্র নামে মহিলাদের একটি সংস্থা আছে। একবার তাদের দলনেত্রী স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকাতে চাকুরীরত তাদের ছেলের কাছে বেড়াতে গেলেন। সেই উপলক্ষ্যে পাসফোর্ট ভিসা এবং নিজেদের বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করাতে হল। দলনেত্রী আমেরিকা থেকে ফিরে আসা মাত্র অন্য সদস্যরা একযোগে দাবী তুললেন, 'আমাদের দিদি বিয়ে করে যখন সদ্য আমেরিকা থেকে হানিমুন সেরে ফিরলেন, তখন আমাদের খাওয়াটা বাদ যাবে কেন?' সঙ্গে সঙ্গে সকলের ভূরিভোজের ব্যবস্থা করা হোল।

পেট কাটা বউ

এক বাড়ীতে তিন বৌ-এর নাম যথাক্রমে উমা, গৌরী ও কৃষ্ণা। এরকম সচরাচর দেখা যায় না। এরপরে আর এক বৌ ঘরে এল, কিন্তু তিনি দেবদেবীদের মধ্য থেকে কেউ নন। ব্যাপারটা বৃদ্ধা শাশুড়ীর মনঃপূত হল না। তিনি ছোট বৌ-এর নতুন নাম রাখলেন শিবানী। যাই হোক চার বউ-এর মধ্যে ভীষণ মিল। যে কোন দায়িত্ব এলে চার বৌ সে দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেন। কিন্তু একবার বাড়ীতে দুঃসময় ঘনিয়ে এল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৌ এর যথাক্রমে পেটে টিউমার ও গল ব্লাডার অপারেশন হল। চতুর্থ বৌ এর সিজারিয়ান করে পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে গেল। ঠিক এর পর পরই বড় বৌ এর ছেলের বিয়ের দিন ঠিক।

তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম এসে গেল, কিন্তু কে কাজ করবে, সব বৌ এর তো পেট কাটা।'

চোর ধরা

প্রতুল আমার অফিসের সহকর্মী। তাঁর সন্দেহ ছিল কিছু কিছু কর্মচারী সুযোগ পেলেই আফিস থেকে আগে কেটে পড়ে। একদিন হাতে নাতে একজনকে ধরেও ফেলল। পরদিন সগর্বে সকলের সামনে সেই কথা ঘোষণা করল। বলল, 'সলিল পাল প্রতিদিনই আফিস পালায়। নিজে ভাবে কেউ টের পাবে না। কিন্তু গতকাল পড়বি তো পড় একেবারে আমার মুখোমুখি। দেখি বিকেল চারটার সময় ধর্মতলায় এক দোকান থেকে বের হচ্ছে।' এই অভিযোগ শুনে সলিল পাল এতটুকু ঘাবড়াল না। শুধু বলল, 'সবাই শুনুন প্রতুল কি বলছে।' একথা কানে যেতে প্রতুল একেবারে চুপ হয়ে গেল। কোন কথাই বলতে পারল না। ও নিজেও যে গতকাল ধর্মতলা গিয়েছিল সে কথা আদপেই খেয়াল ছিল না।

দুঃখ

প্রত্যেকের জীবনেই কিছু না কিছু দুঃখ থাকে। আমার আফিসের গ্রেড থ্রী ষ্টাফ অশ্বিনীবাবুরও দুঃখ থাকতেই পারে। কিন্তু তার সবচাইতে বড় দুঃখ যে তিনি যার অধীনে চাকুরী করেন সেই সলিলবাবু অশ্বিনীবাবুর কাছে নিজের স্ত্রীকে শালী বলে পরিচয় দিয়েছেন। ব্যাপারটা একটু খুলে বলি। অশ্বিনীবাবু একজন প্রবীন ব্যক্তি। খুবই বিনয়ী ও ভদ্র। কিন্তু তার একটিই দোষ- কোন খবর কানে যাওয়া মাত্র সে তা পাঁচ কান করে বেড়ায়। একদিন এক মহিলা সলিলবাবুর খোঁজে দপ্তরে এলেন। অশ্বিনীবাবুই তাঁকে সলিলবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি চলে গেলে অশ্বিনীবাবু সলিলবাবুর কাছে খোঁজ নিতে গেলে তিনি বললেন যে তাঁর শালী এসেছিলেন। সে কথা শুনে অশ্বিনীবাবু আর কোন উৎসাহ দেখান নি। পরে জানতে পারলেন একদিন সলিলবাবুর স্ত্রী দপ্তরে এসেছিলেন। শুনে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তার নাকের ডগায় এই ঘটনা ঘটলেও তিনি বিন্দুমাত্র টের পাননি— এমনকি মহিলাকেও ভাল করে তাকিয়ে দেখেন নি। প্রত্যেক কর্মচারীরই নিজ বসের স্ত্রী সম্বন্ধে অদম্য কৌতুহল থাকে অথচ অশ্বিনীবাবুর বুদ্ধির অভাবে তাঁকে দেখার সুযোগ নষ্ট হল। ফলে নিজের সহকর্মীদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা তলানীতে গিয়ে ঠেকল। অশ্বিনীবাবু তাঁর নিজের সাহেবের এই আচরণে মনে ভীষণ আঘাত পেলেন। আমার কাছে এসে দুঃখ করে বললেন, 'স্যার কেউ কি নিজের বউকে কখনও শালী বলে?'

সুরাহা

সেবারে এক বিরাট দল নিয়ে কুচবিহারে চলেছি। সেখানে এক আত্মীয়ার বিবাহ। আমরাই পাত্রীর অভিভাবক। কিন্তু রীতি রেওয়াজ সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই। তাই বিধবা মাকে সঙ্গে নিলাম। ভাবলাম যত ঝক্কি তিনিই সামলাবেন। হাতে হাতেই ফল মিলল। ক্লান্তিকর ট্রেন ও বাস যাত্রা শেষ করে অবশেষে বিয়ে বাড়ীতে হাজির হলাম। মা কিন্তু সেখানে এক গ্লাস জলও খেলেন না। কারণ সেই বাড়ীতে নিরামিষ রান্না করা বা খাবার মত কোন বাসনপত্র ছিল না। এক রিক্সা ডেকে সোজা অন্য এক বাড়ীতে চলে গেলেন। ফিরলেন বিয়ের দিন দুপুর বেলা। খানিক বাদে টিফিন ক্যারিয়ারে করে একজন তাঁর খাবার পৌছে দিয়ে গেল। আমি তখন একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে চলেছি। মা ওকে এক বাড়ীতে নিমন্ত্রন করে আসতে বললেন। আমি ভীষণ অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি তো নিজেই বলতে পারতে। দুদিন সেখানেই ছিলে এবং এখন সেই বাড়ী থেকেই আসছ।' মা বললেন, 'আমি বলার কে?' আমি বললাম, 'যাকে পাঠাচ্ছ সে তো এ বাড়ীর কেউ নয়।' মা বললেন, তুই যে আছিস।' আমি বললাম, 'আমি কাউকেই চিনি না।' মা বললেন, 'তাহলে বলিস না।'

যুক্তিবাদী

আমাদের প্রতিবেশী একটি ছেলে মাঝে মাঝে মদ খেয়ে মাতলামি করত। কিন্তু নেশা কেটে গেলে খুব ভাল ভাল কথা বলত। একদিন তার মদ খাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললে সে বলল, 'আমি কি আর ইচ্ছে করে মদ খাই? মদ খাই নিতান্ত দুঃখে।' কিসের দুঃখ জানতে চাইলে সে বলল, 'মা সকলকে বলে বেড়ায়—আমার ছেলে মাতাল।'

খড়কুটো

আজকাল ওয়েবসাইট ও ই-মেলের দৌরাত্মে অনেকেই তটস্থ। এমনকি বাঘা বাঘা অধ্যাপকেরা অবধি নিজেদের অসহায় বোধ করছেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে কিছু একটা না করলেই নয়। সেই পরিস্থিতি নিয়ে কয়েকজন ডাক্তারী কলেজের অধ্যাপক নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছেন। কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি :

—কিন্তু কীই আমাদের করার আছে?

—করণীয় একটাই, আমাদের সকলকে কম্পিউটার শিখতে হবে।

—তা কী করে সম্ভব? আমরাও কি ছাত্রদের সঙ্গে কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হব?

—না না তা কেন? আমরা নিজেরাই চাঁদা তুলে একটা কম্পিউটার কিনে নেব।

—তা না হয় হল। কিন্তু শেখাবে কে?

—কেন, প্রশান্তর বউ।

কথাটা নিতান্ত ফেলনা নয়। একজন অধ্যাপক সম্প্রতি বিয়ে করছেন। তাঁর স্ত্রী যখন বি-এড পড়তেন তখন কিছুটা কম্পিউটার শিখেছিলেন। তবে তা বলার মত কিছুই নয়।

গাইড

বাড়ীতে একজন নতুন বধুর আগমন ঘটেছে। তিনি হলেন আকাশের কাকীমা। তাঁকে খুদে আকাশ ছোট মা বলেই ডাকত। একদিন আকাশ ছোটমাকে বাগানে নিয়ে গেল। কিন্তু আম গাছ তলায় গিয়ে কোন আম পাওয়া গেল না। অদূরেই একটা চালতা গাছ আছে। সেই গাছের নীচে একটি চালতা পড়ে থাকতে দেখা গেল। কিন্তু সেটির নাম খুদে শিশুটি মনে করতে পারল না। তবে নামে কী আসে যায়? গোলাপকে যে নামেই ডাকুন না কেন, তার মিষ্টি গন্ধের এতটুকু হেরফের হয় না। অতএব আকাশও চালতার নাম নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাল না। চালতাটির দিকে ছোটমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল—টক ডাল। ওর ছোটমাও সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

বলার নয়

এই রাজ্যে কয়েকটি বড় ধরণের পরীক্ষা নেওয়া হয় যেখানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা থাকে কয়েক লক্ষ। সে সব পরীক্ষা যখন সুরু হয় তখন মনে হয় যেন রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেল। তারই একটি আংশিক চিত্র তুলে ধরছি। পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষকদের কাছে বিলি করা হবে। আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখা হয়নি। প্রধান কার্যালয়ের বাইরে প্যান্ডেল করে কয়েকশ চেয়ার পেতে রাখা হয়েছে। মাননীয় পুরুষ ও মহিলা পরীক্ষকগণ সেখানে বসে আছেন। সেখানে রীতিমত ভীড়। কিভাবে উত্তরপত্র বিলি করা হবে তা মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে। হঠাৎ ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল, 'শ্রীমতি বসুধা রায়, আপনি আজ বাড়ী চলে যান—আপনার ডেলিভারী ডেট

কাল।' ঘোষনাটি শুনেই ভীড়ের মধ্য থেকে একজন তরুণী অধ্যাপিকা ভীষণ বিব্রতভাবে উঠে দাড়ালেন এবং মুহুর্ত দেরী না করে ত্রস্তপদে প্রস্থান করলেন।

কেচে গণ্ডুষ

কিছুদিন আগে একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলেন। সংগে সংগে ফিজিওথেরাপিস্ট এল। তিনি নিয়মিত এসে ম্যাসাজ ও শরীরচর্চা করাতে লাগলেন। তবে কথাবার্তার জড়তা কাটাবার জন্য কিছু করণীয় সম্বন্ধে বাড়ীর লোকজনদের নির্দেশ দিলেন। বাড়ীর লোকজন চেষ্টার ক্রটী রাখলেন না এবং প্রচ্ছন্নভাবে অধ্যাপকের উপর তা প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হলেন। প্রথমেই ছোট্ট নাতনী এগিয়ে এল। সে চুইং গাম হাতে নিয়ে কয়েকবার দাদুকে খাবার জন্য সাধাসাধি করল। কিন্তু তিনি কোন আগ্রহ দেখালেন না। অন্য এক সময় একটা জ্বলন্ত মোমবাতি এনে দাদুকে তা নেভাতে বলল। কিন্তু তিনি তাতেও ধরা দিলেন না। সবশেষে এগিয়ে এলেন অধ্যাপকের পত্নী। অধ্যাপক যখন হালকা মেজাজে ছিলেন তখন তিনি স্বামীকে বলতে বললেন—অ। মনে হল তাতেই সঙ্গে সঙ্গে কাজ হল। যে কোন শিক্ষকের উপর মাস্টারী ফলাতে গেলে তাঁর অবচেতন মনেও প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। অধ্যাপকটি হঠাৎ রেগে গিয়ে নিজের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করে স্ত্রীকে এক প্রচন্ড ধমক দিলেন।

মিসিং লিঙ্ক

একদিন দীর্ঘ সময় ধরে রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলেই কম বেশী তিতি বিরক্ত। আমার আগেই লাইনে দাড়িয়ে ছিলেন সিংজী। অদূরেই তাঁর একটি কাঠের দোকান। অবশেষে সিংজীর রেশন তোলার সময় এল। তিনি রেশন সামগ্রী কয়েকটি ব্যাগে ভরে নিলেন। ঠিক সেই সময়ই একটা অঘটন ঘটল। তিনি চালের ব্যাগে একটি মুগ ডালের ঠোঙা রাখতে গিয়েছিলেন। ঠোঙাটি ফেটে গিয়ে চালে ডালে মিশে গেল। সিংজীর মুখ দিয়ে কিছু বিরক্তিসূচক মন্তব্য বেরিয়ে এল। আমাদের পেছনেই লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন লাহিড়ীবাবু। কোন অবস্থাতেই লাহিড়ীবাবুকে বিরক্ত হতে দেখিনি। তিনি হাসি মুখে বললেন, 'গুসসা মত কীজিয়ে সিংজী। আপকো তো খুশ হোনা চাহিয়ে। বহুত দিক্কতসে আপ বাচ গয়ে।' সিংজী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেয়সে?' লাহিড়ীবাবু বললেন, 'এইসে খিচুড়ী বন গয়ী।' অদূরেই লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন রায়বাবু। বুদ্ধিতে তিনিও কম যান না। তিনি বললেন, 'লেকিন থোড়া সা কাম আভী ভী বাকী হ্যায়।' সিংজী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে

রায়বাবুর দিকে তাকালেন। রায়বাবু বললেন, 'মেহেরবানী করকে থোড়াসা গেহুঁ উসমে মেলা লিজিয়ে।' সিংজী বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'উসসে কেয়া বনেগা?' এক গাল হেসে রায়বাবু বললেন, 'জগা খিচুড়ী।'

সখ

সারা বছর খুদে পায়েলের সংগে ওর ছোট ঠাকুমার খটমট লেগেই থাকে। কয়েকদিন আগে ওর ছোট ঠাকুমা জানালেন, 'এবারে আমার পুজোতে শাড়ী চাই না। শুধু চাই রেনফরেস্ট অর্থাৎ গাছপাতার এমব্রয়ডারি করা ক্রেপ কুর্তা, সংগে ডাই করা আলট্রা সফট্ কালারের ওড়না এবং ঢোলা সালোয়ার। মোদ্দা কথা পায়েলের পোষাকের মত একখানা জমকালো পোষাক চাই।' কথাটা কানে যেতেই পায়েল একেবারে হতবাক হয়ে গেল। খানিক বাদে একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, 'বুড়ীর তো সখ কম না।'

আবিরের রঙ

আবির একজন সপ্রতিভ কিশোর। যেখানে যায় চোখ কান খোলা রেখে চলে। ছোটদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। ওর জোকস্ এর সংগ্রহ কম নয়। তারই কিছু নমুনা ঃ—

এক বাড়ীর পোষা কুকুরটি মারা গিয়েছে। বাড়ীর হিন্দুস্থানী চাকর কেঁদেই আকুল। চাকরের কান্ড কারখানা দেখে বাড়ীর কর্তা তাজ্জব বনে গেলেন। চাকরকে ডেকে বললেন, 'তোর দুঃখ করার কী আছে? আমরা তো দুঃখে ভেঙ্গে পড়িনি।' চাকরটি অনেক কষ্টে নিজের কান্না থামিয়ে বলল, 'আভি তো সারী বর্তন মুঝেই সাফ করনা পড়েগা।'

* * *

দীর্ঘদিন আগের কথা। মানুষ নিয়ে প্রথম মহাকাশযান আকাশে পাড়ি দিতে চলেছে। যারা মহাকাশে যেতে ইচ্ছুক তাদের কাছ থেকে টেন্ডার ডাকা হল। উদ্যোক্তারা জানালেন যে টাকা পয়সা দিতে তারা কার্পণ্য করবেন না। টেন্ডার জমা দিলেন একজন ইংরেজ, একজন ফরাসী ভদ্রলোক এবং ভারতবর্ষ থেকে একজন মারোয়াড়ী। তাদের দাবী যথাক্রমে এক লক্ষ, দুই লক্ষ ও তিন লক্ষ টাকা। দেশ বিদেশের সাংবাদিকগণ ভাবী মহাকাশচারীদের সাক্ষাৎকার নিতে এলেন। কে কিভাবে টাকাটা খরচ করবেন তা জানতে চাওয়া হল। ইংরেজ ভদ্রলোক জানালেন, 'আমি

আমি পৃথিবীতে বেঁচে ফিরে আসতে পারব কিনা ঠিক নেই। কারণেই পুরো টাকাটা আমি পরিজনদের ভরণপোষণের জন্য রেখে যাব।' ফরাসী ভদ্রলোকও অনুরূপ মত পোষণ করে বললেন যে তিনিও এক লক্ষ টাকা পরিজনদের দিয়ে যাবেন, তবে তার আগে নিজের মনের সাধ মিটিয়ে বাকী টাকায় ফূর্তি করবেন। এবারে সাংবাদিকগণ মারোয়াড়ী ভদ্রলোকের পরিকল্পনা জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'প্রথমেই আমি এক লক্ষ টাকা খরচ করে আপনাদের জন্য এক পার্টি দেব। বাকী এক লক্ষ টাকা আমার নিজের জন্য থাকবে।' সাংবাদিকগণ জানতে চাইলেন, 'তারপর বাকী টাকার কী হবে? আপনি তো মহাকাশে পাড়ি দেবেন।' মারোয়াড়ী ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'না না আমি মহাকাশে যাব কেন? ঐ এক লক্ষ টাকা দিয়ে ইংরেজ ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দেব।'

* * *

একটি খামার সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকাতে একবার ভীষণ অগ্নিকান্ড ঘটে। শহর থেকে দমকলকে তলব করা হয়। দমকলকর্মীরা আগুন নেভাতে অসমর্থ হয়। সেই স্থানে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ছিল। বাধ্য হয়ে তাদেরও সাহায্য চাওয়া হয়। তারাও একটি ভাঙ্গাচোরা দমকলগাড়ী নিয়ে চলে আসে। চলে আসে বললে কথাটা ঠিক বলা হল না। তারা তাদের গাড়ী নিয়ে সোজাসুজি আগুনের মাঝখানে ঢুকে পড়ে এবং মরিয়া হয়ে আগুনের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে। তারা অচিরেই আগুনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং ধীরে ধীরে আগুন আয়ত্তে এসে যায়। স্থানীয় এক সংবাদপত্র তাদের এই সাফল্যের কথা সগর্বে ঘোষণা করা হয়। অনেক টাকা পুরস্কারও মেলে তারপরেই সাংবাদিকরা এসে এই সংস্থার সম্পাদকের কাছ থেকে জানতে চান, 'এতগুলো টাকা পেলে আপনারা কী করবেন?' সম্পাদক নিঃস্পৃহভাবে জানালেন, 'প্রথমেই আমরা আমাদের গাড়ীর ব্রেক ঠিক করব।'

* * *

এক সেনানিবাসে সারি সারি তাবুতে সেনারা নিদ্রামগ্ন। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই এক জুনিয়ার অফিসার হাকডাক সুরু করে দিলেন। বলতে লাগলেন, 'ওরে তোরা সব উঠে পড়। সামনে সারাদিনের কঠোর খাটুনী পড়ে আছে। ঐ দ্যাখ সূর্যও আকাশে উঁকি দিয়েছে।' এ কথা বলা মাত্র দিগন্তে সূর্য আবার ঝুপ করে ডুবে গেল।

* * *

মিলিটারী ব্যারাকের এক সৈন্য কথায় কথায় বাজী ধরত। একবার সে অন্যত্র বদলী হল। তখন সেখানকার কমান্ডিং অফিসার নূতন ইউনিটের প্রধানকে এক চিঠি দিয়ে সৈন্যটির বাজী ধরার অভ্যাস সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন। তবে এই সঙ্গে এও

জানান যে তাঁর সম্বন্ধে অন্য কোন অভিযোগ নেই। সৈন্যটি সেখানে কাজে যোগ দিলে নূতন অফিসার তাঁকে ডেকে বললেন, 'কি হে ছোকরা তুমি নাকি খুব বাজী ধর? এখানে কিন্তু কোন সুবিধা হবে না। আচ্ছা কিসের উপর এত বাজী ধর?' সৈন্যটি জানাল, —'স্যার, আমি যে কোন জিনিষের উপর বাজী ধরি। যেমন আমি বলতে পারি আপনার পশ্চাদ্দেশে একটি তিল আছে। এর জন্য আমি পাঁচশ টাকা বাজী ধরতে ও রাজী।' অফিসার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি বাজী ধরা একেবারেই পছন্দ করিনা। তাছাড়া বাজী ধরলেই বাজী জেতা যায় না।' এই বলে তিনি নিজের প্যান্ট খুলে দেখিয়ে দিলেন যে তাঁর পশ্চাদ্দেশে কোন তিল নেই। সৈন্যটি বিনা প্রতিবাদে বাজীর টাকা দিয়ে দিল। সৈন্যটিকে জব্দ করতে পেরে অফিসার বেজায় খুশী। তিনি পূর্বতন অফিসারকে চিঠি দিয়ে এই ঘটনা উল্লেখ করে জানালেন— আশা করি ভবিষ্যতে সে আর কোনদিনই বাজী ধরবে না। সংগে সংগে চিঠির উত্তর এল। আগের অফিসার লিখেছেন, 'আপনার ধারণা সঠিক নয়। কারণ এখান থেকে রওনা হবার আগে সে আমাদের সঙ্গে এই বলে এক হাজার টাকা বাজী ধরেছিল যে সে কাজে যোগ দিয়েই নূতন আফিসারের প্যান্ট খুলে ফেলবে।'

* * *

এক সর্দারজী রাস্তায় বের হয়েছে। হঠাৎ দেখতে পেল রাস্তার মাঝখানে একটা কলার খোসা পড়ে আছে। দেখেই সে আতংকিত হয়ে পড়ল। নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলল, 'আজ ফিন গিরনা পড়েগা।'

খুঁটি

অরুণ একদিন বাড়ীর ছোটদের ডেকে বলল, 'আগামীকাল একোয়েটিকা ওয়াটার পার্ক দেখতে যাচ্ছি। যাদের যথেষ্ট সাহস আছে বলে মনে কর তারা আমার সঙ্গে যেতে পার।' প্রথমটা ইতস্ততঃ করলেও শেষ পর্য্যন্ত ছোটদের সকলেই অরুণের গাড়ীতে গিয়ে উঠল। পার্কে ঢুকে অরুণ বলল, 'তাহলে ব্ল্যাক হোল বা টর্নেডো দিয়ে সুরু করা যাক।' কিন্তু অবাক কান্ড ছোটদের কাউকেই সেখানে দেখতে পাওয়া গেল না। আবার সেখান থেকে সহজ রাইডের কাছে যেতে তাদের সকলেই এক এক করে ফিরে এল এবং নিজ নিজ বয়স অনুযায়ী সার্ফ রেসার, টু এন্ ফ্রো, লেজি রীভার, মিসিসিপি রাইড, বাবল আপ্ ইত্যাদি রাইডে চড়ল। পার্ক থেকে যখন সকলে বের হল তখন সকলেরই চোখে মুখে টান টান উত্তেজনা। কে কতটা সাহসের পরিচয় দিয়েছে ছোটদের সকলে সে কথা বলতেই ব্যস্ত। সানুও বাদ গেল

না। তবে ও বারবার বলতে লাগল, 'বাবা এলে যা হোত না!' ওর কথা শুনে একজন বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোর বাবা এলে তুই কি এর চাইতে বেশী রাইডে চড়তি?' সানু থতমত খেয়ে বলল, 'ঠিক তা নয়, বাবা এসব রাইডে উঠতেই দিত না।'

প্রতিফলন

আজকাল খুব শিশু বয়স থেকে ছোটদের বিজ্ঞানে হাতে খড়ি হয়ে যায়। ফলে ছোটবেলা থেকেই ওরা বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে উঠে। প্রতিদিনের কথাবার্তায় তার প্রতিফলন দেখা যায়। আমার এক আত্মীয়া একদিন তাঁর ছোটমেয়েকে ডেকে ঘরের বালিশগুলো ছাদে রোদে দিয়ে আসতে বললেন। সে ছাদ থেকে ঘুরে এসে বলল, 'রোদে দিয়ে কোন লাভ হবে না, আজ রোদের ভোলটেজ কম।'

ফ্লপ শো

বুটুন আমার ভাগ্নে। অবিসংবাদিতভাবে এলাকার টিন এজারদের দলপতি। এমনিতে বেজায় ভদ্র ও নম্র। কিন্তু ওকে নিয়ে একটাই মুস্কিল। ওর মগজে কোন খেয়াল চেপে বসলে তা কিছুতেই নামতে চায় না। কিছুদিন হল ওর এক বন্ধু ফ্যাশন টেকনোলজি কোর্সে ভর্তি হয়েছে। সেই সুবাদে ও এখন ফ্যাসন বিশেষজ্ঞ। টিন এজারদের কাছে ওর চাহিদা এখন তুঙ্গে। ওর অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত কেউ নূতন পোষাক গায়ে তোলেনা। অনুগামীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ও প্রত্যেকের বয়স, উচ্চতা, দেহের গড়ন, গায়ের রং, হাঁটা চলার ভঙ্গী, মুখের আদল, চুলের ছাট ও স্মার্টনেস যাচাই করে পোষাক এবং জুতো সম্বন্ধে যে সব টিপস্ দেয়, সকলেই তা অভ্রান্ত বলে মনে করে। এক বয়সী দুজন একরকম দেখতে হলেও দুজনের পোষাক যে একরকম হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ উভয়ের মধ্যে যে বেশী হাসিখুশী তাঁর পোষাকের রং হবে অপেক্ষাকৃত ব্রাইট। বাড়ীতে মন্টি ও মিষ্টি নামে ওর ছোট ছোট দুই ভাগ্নী আছে। বাচ্চাদের মাঝে মাঝে চুল কাটিয়ে আনা হয়। ও একদিন বলল, এসব বয়েজ কাট ও চাইনীজ কাট এখন আউটডেটেড, এখন থেকে আমিই এদিকটা দেখছি। তারপর একদিন বাচ্চাদের বিউটি পার্লারে নিয়ে গিয়ে কি হেয়ার কাটিং করিয়ে আনল জানি না, তবে মিষ্টিকেই ওর মা চিনতে পারে না। এখন প্রতিমাসেই হেয়ার কাটিং রদ বদল হচ্ছে। বর্তমানে ইউ কাট, ডিপ ভি কাট, ফেদার কাট, লেহার কাট হয়ে মাশরুম কাটে এসে ঠেকেছে এবং আরও

কী কাট বাকী আছে তা নিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছে। ওর ড্রেস কোড আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাড়ীতেই পোষাকের মেলা বসে গিয়েছে। ওর অনুগামীদের কেউ কাউবয় ফিট জিনস ট্রাউজার, কেউ চিনোস, কেউ বা স্মার্ট ব্লেজার বা বারমুডা ও প্লাটফর্ম পরে ঘুরে বেড়ায়। শুধু তাই নয় বিভিন্ন সমস্যা রীতিমত ওয়ার্কশপ চলত। সত্যি কথা বলতে কি ড্রেস কোড সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। কার্গো প্যান্টের যে একটা বাড়তি নী পকেট থাকে সে খবর অনেকেই রাখে না। ট্রাউজার কিনতে গেলে সেটা প্লীটেড বা প্লীটলেস অথবা ফ্ল্যাট ফ্রন্টেড কিনা এই খবরটুকু জেনেই সকলে সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু যেটা দেখা উচিত সেটা হল তা রিংকল ফ্রী কিনা, স্টেইন ফ্রী কি না এবং সম্ভব হলে ফায়ার রেজিস্ট্যান্ট কি না। টি সার্ট কিনলে তা সিল্ক ডেনিমের উপর গেঞ্জী ফিনিস হওয়া দরকার। সার্ট কিনলে তাতে থার্মো ফিউজ বোতাম আছে কিনা দেখে নিতে হবে। তাতে গরম ইস্ত্রী চালালেও বোতাম নষ্ট হবার ভয় থাকে না। তবে এন্টি ওডার শার্ট পেলে তো কথাই নেই। ব্লাউজ কিনলে দেখা উচিত সেটার ফেব্রিক অ্যান্টি স্ট্যাটিক ফিনিস এবং মাইক্রো ফাইবার কিনা। শাড়ীর ভ্যারাইটি অনেক তবে সিল্ক শাড়ীর ক্ষেত্রে তা মিক্স এন্ড ম্যাচ বা হাফ এন্ড হাফ হলে ভবিষ্যতে কোন ভাবনা থাকে না। আসল কথা দি কমপ্লিট ম্যান বা উত্তম্যান হতে গেলে সব দিকেই নজর দেয়া দরকার। কিন্তু এত জাঁকজমকের মধ্যেও বুটুন ছিল ভীষণ সংযত। ওর বয়সী আর সব ছেলেরা যেখানে বাহারী পোষাক পরে, সেখানে ও গায়ে দেয় ন্যারো এবং ভার্টিকাল স্ট্রাইপ দেয়া এক বিশেষ ধরনের শার্ট। আমাদের মত আনাড়ীর চোখে সেই শার্টের ছিরি ছাদ কিছুই নজরে পড়ে না। তবে ও বলে, সেটাই নাকি লেটেষ্ট ট্রেন্ড। ভয়ে কেউ কোন কথা বলতে সাহস পায় না। যাই হোক অনেকেরই অগোচরে আমাদের বাড়ীতে টিন এজারদের একটি দল দানা বাধতে লাগল যারা পোষাকে আশাকে, চালে চলনে, কথাবার্তায় সব সময় টিপ টপ থাকতে ভালবাসে। বুটুন একাধারে এই দলের বিউটিসিয়ান, ডায়েটিসিয়ান, ফিটনেস ও ফ্যাশন বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যে কিছু কিছু মেয়ে ডায়েটিং সুরু করে দিয়েছে। ভবিষ্যতে এখানে থেকেই ক্যাটওয়াকের তালিম সুরু হবে কিনা জানি না। এ ভাবেই দিনগুলো চলছিল। কিন্তু আচমকা এক বিপদ ঘনিয়ে এল। বুটুন একদিন সবাইকে নিয়ে এক বিয়েবাড়ীতে গিয়েছে। যেখানে দেখা গেল ও যে সার্ট গায়ে দিয়েছে অবিকল সেই ধরনের সার্ট গায়ে চড়িয়ে ক্যাটারারের লোকজন খাবার পরিবেশন করছে। ও রীতিমত অস্বস্তিতে পড়ে গেল। লজ্জায় খাবার টেবিলে গিয়ে বসতে

পারল না। নিন্দুকেরা এতদিন ওদের আশেপাশেই প্রচ্ছন্নভাবে অপেক্ষা করছিল। এবারে তারা সুযোগ পেয়ে গেল। মাঝখান থেকে ওর অনুগামীদের কিছু বাঁকাচোরা কথা শুনতে হল। ওরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে এই একইরকম পোষাকের জন্য কৈফিয়ৎ দাবী করল। বুটুন কোন সদুত্তর দিতে পারল না। ও যে ক্যাটারিং এর জন্য ছেলে তৈরী করছে একথা ইতিমধ্যে চাউর হয়ে গিয়েছে। বুটুনের অনুগামীরা চুপ করে বসে রইল না। তারা সংগে সংগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল। প্রথমেই বুটুনের কনসালট্যান্ট পদটি খোয়া গেল। তারপর ওরা ওর মার কাছে গিয়ে নালিশ জানাল। ওর মা এমনিতেই ছেলের হালচাল নিয়ে খুশী ছিলেন না। তিনি খুব বিরক্ত হয়ে ছেলের সব কয়টি গায়ের জামা স্টীলের বাসনওয়ালীর হাতে তুলে দিলেন। বুটুনের যে সমস্ত পোষাক এতদিন বাক্সবন্দী হয়ে ছিল তা বের করে দেওয়া হল। বর্তমানে এলাকার টিন এজারর‍্রা কেউ ড্রেস কোড নিয়ে মাথা ঘামায় না। যার যে পোষাক চোখে ভাল লাগে সে তাই ব্যবহার করে। আর বুটুন? সে এখন আউটডেটেড বাহারী পোষাক পরে মনমরা হয়ে একা একা ঘুরে বেড়ায়।

গল্প নয়

এবারে এমন দুটি ঘটনা বলব যার কাছে মানুষের সমস্ত বিচার বুদ্ধি অগম্য। ট্রেনের নিত্যযাত্রী এক মহিলা ট্রেনের মহিলা কামরায় একটি লেডীস ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়ে কদিন ধরে সেই ব্যাগের মালিককে হন্যে হয়ে খুঁজছেন। কদিন পরে তাঁর দেখা পেতেই তিনি ব্যাগটি ফেরত দিলেন। ব্যাগের মধ্যে গোটা চল্লিশেক টাকাও ছিল। যার ব্যাগ সেই মেয়েটি জানাল এর আগেও বার চারেক তাঁর ব্যাগ খোয়া গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই সেই ব্যাগ ফেরৎ এসেছে। তাঁকে খুঁজতেও হয়নি। এর রহস্য আর কিছুই নয় সেই ব্যাগের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর একখানা ছোট ফটো ছিল।

দ্বিতীয় ঘটনার তারিখ ১৯৬২ সালের ৯ই জুন। একশত বছর আগে সেই দিনটিতে বাগবাজারের একটি বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা প্রথম পদার্পণ করেন। তারই শতবর্ষপূর্তি উৎসব হতে চলেছে। আমার স্ত্রীর খুবই আগ্রহ সেই দিনটিতে মায়ের সেই বাড়ীটিতে গিয়ে নিজের প্রণতি জানাবেন। সাত সকালে কোনরকমে রান্না সেরে মেয়েকে নিয়ে সেখানে রওনা হলেন। খানিক বাদে আমিও আফিসে চলে গেলাম। ফিরলাম সন্ধ্যার পরে। আমার স্ত্রী মায়ের বাড়ী থেকে বেলুড় ও দক্ষিণেশ্বর হয়ে

রাত আটটায় ফিরলেন। কিন্তু সব চাইতে তাজ্জব ব্যাপার সকালে রান্না করা প্রতিটি খাবার সেই অবস্থাতেই আছে। জুন মাসের প্রচন্ড গরমেও দুধ এবং ডাল তরকারী নষ্ট হয়নি, ভাতেও জল ছাড়েনি। এই ঘটনা আমরা সহজে মেনে নিতে পারিনি। এর পর পর দুদিন সকালে ও দুপুরে জ্বাল দেওয়া সত্ত্বেও সন্ধ্যার আগে দুধ নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু সেইদিনটি ছিল এক বিরল ব্যতিক্রম। আমি কিন্তু বিন্দুমাত্র অবাক হইনি। মা স্বয়ং যে নিজমুখে বলেছিলেন, 'আমি পাতানো মা নই, গুরুপত্নী নই- সত্যিকারের মা।' একথা কি কখনও মিথ্যা হতে পারে? সন্তানদের ঘরসংসার মা এবং ঠাকুর ছাড়া আর কে সামলাবেন? জয় মা, জয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।